Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস রানু

রোলঃ 227022324


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস রানু

রোলঃ 227022324

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস রানু, আইডিঃ 227022324 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রানু

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**জান্নাতুল ফেরদৌস রানু**

আইডিঃ 227022324

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকা........................................................................................................1

ইলমের পরিচয় ..............................................................................................1

ইলম ও মা'লুমাতের মাঝে পার্থক্য ........................................................................4

ইলম অর্জন বড় বড় ইবাদত থেকেও উত্তম....................................................................6

ইলমের উদ্দেশ্য ..............................................................................................7

মানুষের মতো মানুষ.........................................................................................8

ইলমের প্রকারভেদ .........................................................................................22

ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের পরিচয় .....................................................................23

ইলম ফরজ হওয়ার দলীল ..................................................................................25

আল্লাহর নিকট ইলমের মর্যাদা...........................................................................27

কুরআন কারীমে বর্ণিত ইলমের ফজিলত ..................................................................27

আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব .......................................................................33

তালিবে ইলমের পরিচয়....................................................................................39

ছাত্রজীবনের গুরুত্ব.........................................................................................39

জীবনের মূল্য ................................................................................................40

দ্বীনী মাদরাসার গুরুত্ব.....................................................................................56

সফলতার রহস্য .............................................................................................56

সময়ের মূল্য দিন এবং কাজ করে যান ....................................................................57

অভিনব ইলম চর্চা ..........................................................................................59

লিপিবদ্ধ ইলমের উপকারিতা...............................................................................60

ইলম প্রচার-প্রসারের গুরুত্ব ...............................................................................61

ইলম অন্বেষণের জন্য জরুরী কিছু বিষয় ..................................................................65

ইলম অনুযায়ী আমল .......................................................................................68

ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম...................................................................71

কুরআন-সুন্নাহর ইলম কেন কল্যাণময়.....................................................................74

ইলম ছাড়া আমলের পরিণাম...............................................................................83

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি ..........................................................................83

অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা ...........................................................................86

প্রকৃত ইলম কীভাবে লাভ হয়?.............................................................................87

ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয়?...............................................................................93

কিতাবের প্রতি ভালোবাসা ........ 93
অকল্পনীয় মুতালাআ........ 94
কিতাবপ্রেমী তিন মনীষী........ 100
ইলম অর্জনের জন্য নিয়ত বিশুদ্ধ করা ........ 103
উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ........ 105
ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয় ........ 114
লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায় ........ 116
নারী-সমাজের তলবে ইলমের প্রয়োজন........ 116
কাফির কি জনসেবার দ্বারা আখিরাতে মুক্তি পাবে ........ 121
ঈমানদার নারী ........ 122
ইলমের পিপাসা ও পরিচর্যা : মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ.-এর দুই মেয়ে........ 155
ইলম সম্মান অর্জনের উপায় ........ 160
ইলম মোতাবেক জীবন গঠন........ 164
তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে কয়েকজন মনীষীর বয়ান ........ 164
হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম এর বয়ান........ 181
তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন-এর জন্য মুতালাআয়ে কুরআনের বিকল্প নেই ........ 189
তাযকিয়ায়ে বাতেন : গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় ........ 190
কুরআনের সাথে চার আমল........ 191
হাদীসের ব্যাপক মুতালাআ........ 192
ফিকহ কুরআন-হাদীসেরই সারনির্যাস........ 193
মুনাযারার একটি উসূল ........ 194
সোহবতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা........ 196
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন ........ 197
আলেমের মাঝে ইসতেগনা থাকা জরুরি ........ 198
আসাতিযায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার নিআমত ........ 200
সময়ের মূল্য অনুধাবন করুন ........ 200
আকাবিরে দেওবন্দকে জানুন ........ 202
পরিশিষ্ট........ 203
তথ্যপঞ্জি........ 207

باسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা

اَلحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العٰلَمِيْنَ ، وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ علٰى سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ وَ خاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ، وَ علٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ – اَمَّا بَعْدُ !

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত তথা পূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানুষের ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আমল করা। আর সঠিক ঈমান ও আমলের জন্য প্রয়োজন কুরআন-হাদীছের ইলম তথা জ্ঞান অর্জন করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।

## ইলমের পরিচয়

আরবী ভাষায় (আরবি: علم, "ইলম") শব্দটি দ্বারা জ্ঞান, অনুধাবন ও উপলব্ধি করা কে বোঝানো হয়।

বাংলা ভাষায় কখনো কখনো এলেম শব্দটি দ্বারাও একে বোঝানো হয়, যার অর্থ হল; জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যা।
তবে ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি দ্বারা প্রায়শই শুধুমাত্র 'ইসলামি জ্ঞান' কে বোঝানো হয়ে থাকে।

ইলম প্রকৃতপক্ষে একটা নূর।পবিত্র কুরআনেও একথা এসেছে:

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَ كِتَٰبٌ مُّبِينٌ ۝

"আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একটি নূর এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব" - সূরা মায়েদা:১৫

আলোচ্য আয়াতে ইলমকে নূর বলা হয়েছে।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেন:

'ইলম হলো এমন নূর গোনাহ করলে যা মিটে যায়, গোনাহগার যা হাসিল করতে পারে না। কিছু শব্দ শেখার নামই ইলম নয়। তাই যদি হতো তবে জার্মান ও বৈরুতের খ্রিষ্টানরা - যারা আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বড় বড় আদীব - তারাও আলেম হতো। বোঝা গেলো, শুধু শব্দজ্ঞানই ইলম নয়।'

অন্য আয়াতে ইলমকে বলা হয়েছে رُوح। যেমন–

وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ

"আল্লাহ পাক তাকে শক্তিশালী করেছেন ইলম দিয়ে"
- সূরা মুজাদালাহ: ২২

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইলমকে সরাসরি নূর বলেছেন:

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِى ٱلنَّاسِ

"আমি তাকে এমন একটি নূর দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে" -সূরা আনআম : ১২২

ইলম এমন নূর যা থাকলে মনে কোনো ভয়-ডর থাকে না। চারপাশ থেকে শত্রু ঘিরে ফেললেও ঘাবড়ে যায় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন একা পেয়ে

এক বুদ্ধু খাপখোলা তরবারি উঁচিয়ে বলেছিল, তোমাকে আমার থেকে কে বাঁচাবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত নিশ্চিতমনে বলেছিলেন "আল্লাহ বাঁচাবেন"। আল্লাহ সেদিন বাঁচিয়েছেন। আলেমগণ এরূপ নির্ভীক হয়ে থাকেন। কেননা, আল্লাহর বিষয়ে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তারা জানেন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করতে পারেন। আল্লাহর প্রত্যেক কাজে কোনো না কোনো হেকমত অবশ্যই থাকে।
ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল।
ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعملِ.

সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম

ইলম বলা হয় যার মাধ্যমে মূর্খতা দূর হয়। মূর্খতা দূর না হলে তার জবান আলেম, কিন্তু অন্তর জাহেল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?'
- সূরা জাছিয়া ২৩

❑ইলমের উৎস :

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

‘ ইলম ছাড়া হালাল-হারামের ব্যাপারে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। ইলম বলা হয় এমন বিষয়কে, যা কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এগুলোর মধ্যে পাওয়া না গেলে এগুলোর মূলনীতির ওপর কিয়াস করে যা অর্জিত হয়’
–আরবি মূলগ্রন্থ, معالم إرشادية পৃষ্ঠা:১৪

❒ ইলম ও হিকমত হলো নূর:

ইমাম মালিক রহ. বলেন,

‘ অধিক মাসআলা জানার নাম ইলম ও হিকমত নয়, বরং এটি হলো নূর। যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন’
– প্রাগুক্ত :১৫

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বাণী :

‘ অধিক হাদীস জানাকে ইলম বলে না, বরং ইলম মূলত আল্লাহর ভয়’
– প্রাগুক্ত

## ইলম ও মা'লুমাতের মাঝে পার্থক্য

হাকিমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, ইলম ও মা'লুমাত এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যেমন ক্ষীণ দৃষ্টির কেউ হাজার মাইল সফর করলেও তার দেখাশোনা হয় কম। তাছাড়া যা দেখে তা-ও ভাসাভাসা। পক্ষান্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কেউ এরচে’ কম সফর করেও বেশি দেখতে পারে। বিষয়টা ঠিক তেমনি। আমাদের মাঝে আর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী সাহেবের মাঝে পার্থক্য ঠিক তেমনি। আমাদের জানাশোনা বেশি, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি কম। আর হাজী সাহেবের জানাশোনা কম, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি বেশি। প্রকৃত ইলম হচ্ছে, সুস্থ উপলব্ধি যা সঠিক পথ দেখায় এবং নিশ্চিন্ত গন্তব্যে পৌঁছায়। এই ইলম শুধু পড়াশোনার মাধ্যমে হাসিল হয় না। এর প্রধান উপায় হলো, **দোয়া-মুনাজাত ও তাকওয়া-পরহেজগারি।**

আলেম কাকে বলে? মুত্তাকী ও মুত্তাবিয়ে সুন্নাতকে আলেম বলে। কেননা মওলবীর নিসবত মাওলার দিকে; মানে মাওলাওয়ালা তথা আল্লাহওয়ালা। আজকাল অধিকাংশ আলেম দরস-তাদরীস নিয়ে মশগুল। ইসলাহের কোনো ফিকির নেই। দরস-তাদরীসের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ইসলাহের প্রয়োজন আরো বেশি। অনেকের মধ্যে দেখা যায়, ইলমের ফিকির অত্যধিক, কিন্তু আমলের ফিকির নেই, কিতাব শেষ করার তাকীদ খুব,কিন্তু ইসলাহের তাকীদ নেই মোটেও। দিনরাতে কত রকম গোনাহ যে করে সে উপলব্ধি পর্যন্ত নেই। বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস নিয়ে গেল, যেখানে সেখানে ফেলে রাখল, ওদিকে মালিক খুঁজে হয়রান। বা কারো সাথে কথা দিয়ে কথা রাখল না। ইত্যাকার হাজারো আখলাকী অপরাধে লিপ্ত,অথচ জানাশোনার কমতি নেই। আসলে জানাই যথেষ্ট না। শয়তানও জানে অনেক। অনেক বড় আলেম শয়তান। অনেক আলেমকে পর্যন্ত ধোঁকায় ফেলে দেয়। আর জানা কথা,কাউকে ধোঁকায় ফেলতে হলে তারচে' বেশি জানতে হয়। শয়তানের অপরাধ হলো, তার জানা ছিল বেশি, কিন্তু মানা কম।

হাদীসে এসেছে, যে ইলম আমলের জন্য নয় তা জাহান্নামের কারণ হবে। আজকাল ছাত্ররা এতটাই গাফেল যে, নিজেদের ইসলাহের সামান্যতম ফিকিরও নেই। অনেকে আছে, ইচ্ছেকৃত গোনাহ করে না, তবে অনিচ্ছায় হয়ে যায়।
[গ্রন্থ: আল ইলমু ওয়াল উলামা]

# ইলম অর্জন বড় বড় ইবাদত থেকেও উত্তম

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাহনুনের কাছে এক ছেলে পড়তে আসত। একদিন তার বাবা এসে বললেন, ‘আমি ঘরের সব কাজ নিজে করি। ছেলে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে বলে তাকে দিয়ে কোনো কাজ করাই না।’ উস্তাদ বললেন, ‘আপনি কি জানেন, এই ছেলেকে পড়ানোর সওয়াব নফল হজ ও ফরয কিফায়া জিহাদ থেকেও বেশি?’

তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া আর যথাসম্ভব তাদেরকে উপার্জন থেকে অমুখাপেক্ষী রাখা,  যাতে তারা নিবিষ্ট মনে ইলম অর্জন করতে পারে। – শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয়:৩৭

একবার সাহাবী আবু মুসা আশআরী রা. ইশার নামাযের পর উমার রা.-এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এসময় আসার কারণ?’
আবু মুসা রা. বললেন, ‘ কিছু ফিকহি আলোচনা ছিল।’
এরপর গভীর রাত পর্যন্ত ইলমি আলোচনা হয়।
একপর্যায়ে আবু মুসা রা. বললেন, ‘এখন নামায পড়া যাক।’
উমার রা. বললেন, ‘ আমরা তো নামাযেই আছি!’
এরপর তারা ফজর পর্যন্ত আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন।

ইবন মাসউদ রা. -এর উক্তি তো বিখ্যাত:

الدِّراسَةُ صَلاةٌ

'পড়ালেখাও ইবাদত’

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর বাণী :

أَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ العِلْمِ؟

' ইলম অন্বেষণ থেকে উত্তম আমল কী হতে পারে?’

–শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয়: ৪৩

# ইলমের উদ্দেশ্য

ইলমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলম অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে কী আদেশ করেছেন আর কী নিষেধ করেছেন তা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। কিছু কিতাব পড়ে মা'লুমাত হাসিল করা ইলম নয়। সাহাবায়ে কেরাম যা শিখতেন সাথে সাথে আমল শুরু করে দিতেন। এক আয়াত করে শিখতেন, তা আমলে পরিণত করে পরের আয়াত শিখতেন।

আবু বকর সিদ্দিক রা. আরব ছিলেন। কুরআন বুঝার জন্য তার নাহু, সরফ, তরজমা প্রয়োজন হয়নি। তবুও তার কথা "আমার সূরা বাকারা শিখতে দু'বছর লেগেছে"। একজন আরব হয়েও সূরা বাকারা শিখতে দু'বছর লাগার কারণ এটাইযে, এক আয়াত শিখে আমলে অভ্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন।

**❒ ইলমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত পাহারপুড়ী রহ.- এর একটি প্রবন্ধ:**

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.
صدق الله مولانا العظيم.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ায় অসংখ্য মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির যখন ইচ্ছা করলেন, ফিরিশতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। বললেন, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' সৃষ্টি করব। আদম ও বনী আদম সৃষ্টি করব। ফিরিশতারা বলল, হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে ফাসাদ করবে, অনাচার করবে, রক্তপাত ঘটাবে, খুনখারাবী করবে-

وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ.

(আমরাই তো আপনার প্রশংসা করছি, তাসবীহ পাঠ করছি, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।)

অর্থাৎ ফিরিশতাদের বুঝে আসছিল না- আল্লাহ তাআলার হেকমত ও রহস্য। কেন আল্লাহ বনী আদম সৃষ্টি করছেন? কেন আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতিকে প্রেরণ করছেন? হেকমত ও রহস্য তো অবশ্যই আছে। কিন্তু কী সেই হেকমত, ফিরিশতাদের তা বুঝে আসছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন-

اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

(আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।)

অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করলে কী হবে- এ বিষয়ে ফিরিশতারা ততটুকু জানে না, যতটুকু আল্লাহ জানেন।

## মানুষের মতো মানুষ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْٓ اٰدَمَ.

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০

অর্থাৎ বনী আদমকে আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছি। সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টির সেরা হল মানুষ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষকে 'মানুষ' হতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মানুষ হিসেবে পয়দা করলেন। কত মহব্বত করে পয়দা করলেন। ফিরিশতাদের প্রশ্নের উপর আল্লাহ পাক বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'।

কী সেই জিনিস, যা আল্লাহ জানেন, ফিরিশতারা জানে না। মানুষের মধ্যে এমন কী জিনিস আছে, যা আল্লাহ তাআলাই শুধু জানেন, আল্লাহর নৈকট্যশীল ফিরিশতারাও জানে না। সেগুলো হল কিছু আখলাক, কিছু আত্মিক গুণ, যেগুলো একজন মানুষকে ফিরিশতাদের থেকেও উপরে নিয়ে যায়। মানুষ শুধু 'রক্তমাংসের' মানুষ হওয়ার কারণেই আশরাফুল মাখলুকাত না; মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তখনই, যখন তার মধ্যে এ সিফাতগুলো বিদ্যমান থাকবে।

আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি, আমরা সবাই তালিবুল ইলম। সেই জিনিসগুলো অর্জন করার জন্যই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। মাদরাসায় জমা হয়েছি। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্যই আমরা মাদরাসায় সমবেত হয়েছি।

## স্বভাব ও তবিয়তের দিক থেকে মানুষ দুই প্রকার

মানুষের মধ্যে জানোয়ারের স্বভাবও আছে, ফিরিশতার স্বভাবও আছে। আমাদের মধ্যে 'মালায়িকা' অর্থাৎ ফিরিশতাদের অংশও আছে, 'বাহায়েম' অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর অংশও আছে। ফিরিশতাদের আখলাকও আছে, জানোয়ারের চরিত্রও আছে। জীবজন্তু- এরা খায়, আমরাও খাই, এদিক দিয়ে জীবজন্তুর সাথে আমাদের সম্পর্ক। এদিক দিয়ে আমাদের সম্পর্ক ফিরিশতাদের সাথে না, জানোয়ারের সাথে। এ হিসাবে জানোয়ারের আখলাক আমাদের মধ্যে আছে।

ফিরিশতারা আল্লাহর যিকির করে। যিকিরের মধ্যে সবসময় মশগুল থাকে। মানুষও আল্লাহর যিকির করে। এদিক থেকে ফিরিশতাদের সাথেও মানুষের সম্পর্ক আছে। ফিরিশতাদের সাথেও মানুষের মিল আছে। ফিরিশতাদের আখলাক মানুষের মধ্যে আছে। যে মানুষ যত বেশি আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, তত বেশি তার মধ্যে ফিরিশতাদের সিফাত বিদ্যমান। সে তত বড় 'ফিরিশতাসিফাত ইনসান'।
আর যিকির-আযকার বাদ দিয়ে শুধুই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যে মানুষ ব্যস্ত, সে হল 'হায়াওয়ানসিফাত ইনসান'। পশুর স্বভাব তার মধ্যে বেশি।

## প্রকৃত মানুষের অবস্থা

প্রকৃত মানুষ যারা, তাদের অবস্থা হল-

يَذْكُرُ اللهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ.

(সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে।)
এটি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত। নবীজী সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

يَذْكُرُ اللهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় আল্লাহর যিকিরের মধ্যে থাকতেন। - মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস ৪৯৩৭

নবীর যারা প্রকৃত আশেক, তাদেরও একই হাল, একই অবস্থা। এমনই একজন মানুষ ছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.। তিনি ছিলেন নবীর সাচ্চা আশেক। পুরোপুরি ফিরিশতাসিফাত ইনসান। হাফেজ্জী হুযূর রহ. সবসময় আল্লাহর যিকির করতেন। ফিরিশতারা সবসময় আল্লাহর যিকির করে। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; তিনিও সবসময় আল্লাহর যিকির করতেন। তো মানুষের মতো মানুষ যারা, তাদেরও অবস্থা এমনই হওয়া চাই যে, তারাও সবসময় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে। এটাই হল প্রকৃত মানুষের অবস্থা।
আর আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল থাকা মানে হল, জানোয়ারের স্বভাব নিয়ে বেঁচে থাকা। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

## মুজাহাদা : মানুষের আসল কাজ

একজন মানুষের মধ্যে যেহেতু ফিরিশতাদের সিফাতও আছে, আবার জানোয়ারের সিফাতও আছে, তো এ অবস্থায় তার করণীয় কী? এ যিন্দেগীতে সে কী করবে?
তার কাজ একটাই, জানোয়ারের স্বভাব দমন করে ফিরিশতার স্বভাব অর্জন করা। এর জন্য প্রয়োজন মুজাহাদার। এর জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খাওয়ার আদেশ করেছেন। বলেছেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا

'খাও, পান কর।'

কিন্তু জানোয়ারের মত শুধু খেতেই বলেননি, বলে দিয়েছেন,

وَلَا تُسْرِفُوْا

'খাওয়া দাওয়া কর; কিন্তু প্রয়োজনের বেশি যেন না হয়, ইসরাফ যেন না হয়'।

তো এর নাম হল মুজাহাদা। মুজাহাদা ছাড়া মানুষ মানুষ হয় না। সাধনা ছাড়া মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায় না।

## এজমালী মুজাহাদা (সংক্ষিপ্ত সাধনা)

এক হল মুজাহাদায়ে এজমালী- সংক্ষিপ্ত মুজাহাদা।
আরেক হল মুজাহাদায়ে তাফসীলী- বিস্তারিত মুজাহাদা।

মুজাহাদায়ে এজমালী হল চারটি কাজ :
১. قلة الطعام (কম খাওয়া)
২. قلة الكلام (কথা কম বলা)
৩. قلة المنام (কম ঘুমানো)
৪. قلة الاختلاط مع الأنام (মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা)

## মুজাহাদা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না

সাধনা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। আল্লাহকে পেতে হলে মুজাহাদা করতেই হবে, সাধনা করতেই হবে। এ চারটি বিষয়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে 'কথা'। কথা কমিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন সকালে এমন প্রতিজ্ঞা করতে হবে, সারাদিন একটা গায়রে জরুরি কথা বলব না। ফজরের পর আযম বিল জযম করতে হবে- হে আল্লাহ! রাতে ঘুমানো পর্যন্ত যা আমি মুখে বলব, জরুরি কথাই বলব, গায়রে জরুরি একটা কথাও আমি বলব না।

## হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর মুজাহাদা

হাফেজ্জী হুযুর রাহ. ছিলেন কথা কম বলার নমুনা। সবসময় আল্লাহর যিকিরের মধ্যেই থাকতেন, ঠোঁট নড়তেই থাকত। আমার এক ছোট বাচ্চা, সুযোগ পেলেই হযরতের কোলে গিয়ে বসত। হযরত যখনই কামরাঙ্গীরচরে আসতেন, বাচ্চাটা অপেক্ষায় থাকত, নানা কখন আসেন, কখন কামরায় বসেন। হযরত এলেই বাচ্চাটা হযরতের দরজার সামনে গিয়ে বলত, 'নানা! আমার পায়ের নিচে মাটি নেই'। অর্থাৎ তার পা পরিষ্কার। সে হযরতের

কামরায় প্রবেশ করতে চায়। হযরতের কোলে বসতে চায়। হযরত বুঝতেন। মুচকি হাসতেন। তারপর বলতেন, ‘বোন! আসো, আসো, আমার কোলে বসো, আমার কোলে বসো’।

তো বাচ্চাটা কোলে গিয়ে বসেই মাথাটা উপর দিকে উঠাত এবং হযরতের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকত। বাচ্চাটা অবাক হত যে, নানার ঠোঁট সবসময় এমন নড়তে থাকে কেন? একদিন আমি বসা ছিলাম সেখানে, বাচ্চাটা হযরতের কোলে বসা, হযরতের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আছে। হযরত বললেন, ‘বোন! তুমি উপর দিকে তাকিয়ে কী দেখ? নানার ঠোঁট নড়ে কেন এটা দেখ? হাঁ, বোন! আমি সবসময় আল্লাহর নাম নিই, আমি আল্লাহর নাম নিই, আমি আল্লাহর নাম নিই।’

## ইলমের উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া

একটা শের হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. পড়তেন-

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است + جز سر عشق ہرچہ بگوئی بطالت است

سعدیؒ بشولوح دِل از نقش غیر حق + علمے کہ راہ حق ننماید جہالت است

‘আল্লাহর যিকির ছাড়া যত কিছুই তুমি কর, তোমার জীবন বৃথা/ আল্লাহর ইশক ছাড়া যত কিছুই তুমি অর্জন কর, সবই বেকার/ সা‘দী! হৃদয় থেকে মুছে ফেল গায়রুল্লাহর নাম/ যে ইলম আল্লাহর পথ না দেখায়, সে ইলম জাহালত ছাড়া কিছুই না।

## শ্রেষ্ঠতম ইবাদত

হাদীসের মধ্যে এসেছে-

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

শ্রেষ্ঠতম ইবাদত হল কুরআন তিলাওয়াত।

-মুজামুস সাহাবা, ইবনে কানে ১/৫৬; ফাযাইলুল কুরআন ওয়া তিলাওয়াতুহু, আবদুর রহমান রাযী, হাদীস ৮১

যারা হাফেযে কুরআন, তারা এর উপর আমল করতে পার। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর যিকির ছিল কুরআন তিলাওয়াত। হাঁটা-চলায় সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হাফেজ্জী হুযূর রহ. কুরআনের পাক্কা হাফেজ ছিলেন। হিফযখানায় যারা পড়, পড়ার মতো পড়ো। মনে রেখো, আল্লাহর কালাম তোমাদের সীনায় দাখেল হচ্ছে। আল্লাহর কালাম! কার কালাম? আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম। আল্লাহু আকবার!

চোখ দিয়ে দেখছ, যবান দিয়ে পড়ছ, সীনায় অঙ্কিত হচ্ছে। কী? আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কথা। গভীরভাবে যদি চিন্তা কর, স্থির থাকতে পারবে না। সঠিকভাবে কল্পনা করলে দিলটা ফেটে যাওয়ার কথা। আল্লাহর কালাম আমরা পড়ছি! আমার মতো গুনাহগার আল্লাহর কালাম পড়ছে! একথা মনে করে দুনিয়ার সব সুখশান্তি ভুলে যাওয়া দরকার যে, আমি আল্লাহর কালাম পড়ছি, আমার মুখে আল্লাহর কালাম উচ্চারিত হচ্ছে!

তো একটি হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। যারা হাফেযে কুরআন, তারা এই হাদীসের উপর আমল করতে পার। আরেকটা হাদীস আছে-

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

‘শ্রেষ্ঠতম যিকির হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।

যারা হাফেয না, তাদের জন্য আল্লাহর নবী সুন্দর ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। তারা এই হাদীসের উপর আমল করবে। যারা হাফেয না, সবসময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়তেই থাকবে। যারা হাফেয, হাঁটাচলায় তারা কুরআন শরীফ পড়তেই থাকবে।

## হাফেজ্জী হুযূরের কুরআন তিলাওয়াত

হাফেজ্জী হুযূর রাহ. মাগরিবের পর আওয়াবীনের নামায পড়তেন। ঐ আওয়াবীনে তিন পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করতেন তিন পারা। এ হল ছয় পারা। এ ছাড়া হাঁটাচলায় পড়তেন আরও তিন পারা। চব্বিশ ঘণ্টায় এই নয় পারা তিনি তিলাওয়াত করতেন। এটি ছিল হযরতের নিয়মিত আমল।

## আল্লাহর যিকির সবসময় করতে হয়

তিলাওয়াতের আমল ছাড়াও হাফেজ্জী হুযূর রাহ. সবসময় আল্লাহর যিকির করতেই থাকতেন। আর মাঝে মাঝে এ শেরটা পড়তেন-

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است

অর্থাৎ, ও আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর যিকির ছাড়া যা-ই তুমি কর, সবকিছুই তোমার জীবনকে বরবাদ করে দেবে। এমন কত কিছুই না আমরা করি, যা করার জিনিস না। এমন কত জিনিসই না আমরা ধরি, যা ধরার জিনিস না। ধরার জিনিস থাকলে আল্লাহ আছেন, আল্লাহকে ধরতে হবে। আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর নাম সবসময় নিতে হবে।

سعدیؔ بشولوح دِل از نقش غیر حق + علمے کہ راہ حق ننماید جہالت است

শেখ সাদী রহ. নিজেকেই বলছেন, 'সা'দী! দিলের মধ্য থেকে গায়রুল্লাহর নকশা ধুয়ে ফেল। যে ইলম তুমি হাসিল করছ, সে ইলম যদি তোমাকে আল্লাহর রাস্তা না দেখায়, আল্লাহ পর্যন্ত না পৌঁছায়, তাহলে কীসের ইলম সেটা, সেটা তো মূর্খতা ছাড়া কিছুই না'।

তো আমার প্রিয় তালেবে ইলম! খেয়াল করে শোন, আমরা যে ইলম শিখছি, আমরা কি আসলে আলেম হচ্ছি, না জাহেল হচ্ছি? শেখ সা'দী রহ. বলছেন, যদি আমি ইলম শিখে আল্লাহকে না পেলাম, তাহলে আমি আলেম না, আমি জাহেল; বরং জাহেল থেকেও বদতর।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রাহ. বলতেন, 'তুমি দুনিয়ার সবকিছু পেয়েছ, কিন্তু আল্লাহকে পাওনি, তবে তুমি কিছুই পাওনি'।
অর্থাৎ তাহলে তুমি একজন নিরীহ ফকীর, তোমার মতো মিসকীন দুনিয়াতে আর নেই। 'আর তুমি দুনিয়ার কিছু পাওনি কিন্তু আল্লাহকে পেয়ে গেছ, তবে তুমি সবকিছু পেয়ে গেছ'। তোমার মতো ধনী দুনিয়াতে কেউ নেই।

শুধু আলেম হয়ো না, ‘আল্লাহওয়ালা আলেম’ হও। আল্লাহওয়ালা আলেম হল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। কেননা সে আল্লাহকে পেয়ে গেছে। আর যে আল্লাহকেই পেয়ে যায়, তার চেয়ে বড় ধনী আর কে আছে।

## হাফেজ্জী হুযূর রাহ. সম্পর্কে হাকীম ইফহামুল্লাহ রাহ.-এর অভিমত

আল্লাহওয়ালাদের কথা উঠলে তাঁদের হাজারো স্মৃতি আমার মাথায় ভীড় করে। মনের মধ্যে তাদের কথার ঢেউ খেলতে থাকে। বাংলাদেশ সফরে হযরত আবরারুল হক ছাহেব রাহ.-এর অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁরই বেয়াই হযরত হাকীম ইফহামুল্লাহ ছাহেব রাহ.। হিন্দুস্তান ফিরে যাওয়ার পর তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি দীর্ঘদিন আমার কাছে সংরক্ষিত ছিল। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর কোথায় যে হারিয়ে গেছে; সেই চিঠিতে হাকীম ছাহেব হাফেজ্জী হুযূর রাহ. সম্পর্কে লেখেন-

تاریخ کے اوراق میں ہم نے ہمارے اکابر کی جو زندگی پڑھی الحمدللہ بنگلہ دیش منل جا کر حضرت حافظ جی حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سمجھا ہمارے اکابرین ایسے تھے-

আমাদের আকাবির বুযুর্গগণ কেমন ছিলেন- আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। আলহামদু লিল্লাহ, বাংলাদেশে গিয়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-কে স্বচক্ষে দেখে বুঝতে পেরেছি- আমাদের আকাবির বুযুর্গগণ এমন ছিলেন।

কাসেম নানূতবী রহ. কেমন ছিলেন, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. কেমন ছিলেন, দেওবন্দের আকাবিরীন কেমন ছিলেন- দেখতে চাইলে বাংলাদেশে গিয়ে হাফেজ্জী হুযূর রহ.-কে দেখে আস। ঠিক আকাবির-আসলাফের বাস্তব নমুনা!

## প্রতিদিন ফজরের পরে একটি অঙ্গিকার

কোনো অতিরিক্ত কথা না বলা চাই। ফজরের পর প্রতিদিন একটা অঙ্গীকার করা, নিজের সাথে নিজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া যে, "আজকে সারাদিন একটিও অতিরিক্ত কথা আমি বলব না, বলবই না। মানুষ তো কত রকম ওয়াদা করে, তো আমি এ ওয়াদা করলাম যে, আমি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটি গুনাহ করব না, একটি বেহুদা কথা বলব না।"

## অতিভোজন রূহানী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়

খাওয়া দাওয়ায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। আল্লাহ বলেছেন, খাও পান কর, কিন্তু ইসরাফ কর না। সীমাতিরিক্ত ভোজনও একপ্রকার ইসরাফ। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমলের জন্য ক্ষতিকর। রূহের জন্য ক্ষতিকর।

সুতরাং এটিও ইসরাফ। এর দ্বারা ঈমানী, আমলী ও রূহানী কুওয়াত কমে যায়।

خداوند گفت كُلُوْ اوَاشْرَبُوْ ا + وليكن نہ گفت كلو تا گلو

আল্লাহ বলেছেন খাও পান কর। বলেননি যে, গলা পর্যন্ত খাও।

## মানুষের সাথে সম্পর্কে সতর্কতা কাম্য

মানুষের সাথে বেশি মেলামেশা না করা উচিত। তোমাদের তালিবে ইলমদের জন্য একথা অনেক বেশি প্রযোজ্য। তালিবুল ইলম কোনোদিন গল্পগুজব করতে পারে না। যারা সত্যিকার তালিবুল ইলম, যারা আল্লাহকে পেতে চায়, তারা কোনোদিন গল্প করে ও মানুষের সাথে 'ইখতিলাত' করে সময় নষ্ট করতে পারে না।

## অতি নিদ্রাও ইলম হাসিলের পথে বাধা

ঘুমের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। খুব বেশি ঘুমানো যাবে না। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। ইলম হাসিলের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর।

## দুনিয়ার লোভ ছাড়তে হবে

ভেতর থেকে লোভ বের করে ফেলতে হবে। দুনিয়ার লোভ অন্তরে রাখা যাবে না। দুনিয়ার লোভ আর ইলম একসঙ্গে জমা হয় না। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-পরার লোভ আছে, বাড়ি-গাড়ির লালসা আছে। কিন্তু একজন তালিবুল ইলমকে এসব লোভ ও লালসা থেকে পবিত্র থাকতে হবে। তালিবুল ইলমকে মুত্তাকী হতে হবে। ফিরিশতাদের মধ্যে লোভ নেই। এজন্য তাদেরকে মুত্তাকী বলা হয় না। যার মধ্যে যে জিনিসের লোভ আছে, সে জিনিস যদি সে ছাড়তে পারে, তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

## তাকওয়া ছাড়া ইলম অর্জন হয় না

প্রত্যেক তালিবে ইলমকে মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকী যদি না হই, ইলম আল্লাহ তাআলা দেবেন না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।
-সূরা আনফাল (৮) : ২৯

সত্য-মিথ্যা ও ভুল-শুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা ইলমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিফাত। আর এই সিফাত আল্লাহ তাআলা দান করবেন কেবল তাদেরকে, যারা তাকওয়ার নীতি আঁকড়ে ধরেছে। সে জন্য ইলম হাসিলের প্রধান শর্তগুলোর একটি হল তাকওয়া অবলম্বন করা।

সুতরাং আল্লাহর কাছ থেকে যদি ইলম পেতে হয়, আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। গুনাহ থেকে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে। তাকওয়া অর্জন করা আমাদের কাজ। আর ইলম দেওয়া আল্লাহর কাজ।

প্রত্যেক তালিবে ইলমের 'জেবে' (পকেটে) মিসওয়াক থাকতে হবে। ওযু করার সময় সবাইকে মিসওয়াক করতে হবে। আর সময়মত চুল কেটে পরিষ্কার করে ফেললে ভালো।

আমরা তো ইলম শেখার জন্যই মাদরাসায় এসেছি। বহু তালিবে ইলম ইলম থেকে মাহরূম হচ্ছে। কেন?  তাকওয়া না থাকার কারণে। তালিবুল ইলম হয়েও তারা ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেন? একটাই কারণ, তারা তালিবুল ইলম হয়েছে; কিন্তু মুত্তাকী হতে পারেনি।

## উস্তাযগণকে দেখে দেখে শিখতে হবে

তালেবে ইলমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল, তারা তাদের উস্তাযগণকে দেখে দেখে শিখবে। উস্তাযরা কীভাবে চলেন, কীভাবে বলেন, কখন কী কাজ করেন, কখন কোন আমল করেন, কোন পরিস্থিতিতে কোন দুআ পড়েন- এগুলো লক্ষ করতে হবে আর শিখতে হবে। কোন উস্তায কীভাবে নামায পড়েন, কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন, কীভাবে কামরায় প্রবেশ করেন, কামরা থেকে বের হন, এসব দেখে দেখেও তো আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারি। উস্তাযকে দেখে দেখে শিখতে হয়। কোন কাজটা কীভাবে করতে হবে, কোন কথাটা কীভাবে বলতে হবে, উপরে উঠতে কী পড়তে হবে, নিচে নামতে কী পড়তে হবে, এই স-ব কিছু উস্তাযদেরকে দেখে দেখে শিখে নিতে হবে।

## মাসনূন দুআগুলো মুখস্থ কর এবং মর্ম অনুবাধন করে আমল কর

প্রত্যেকটি মাসনূন দুআর গভীরে আজীব মর্ম লুকানো আছে। উপরে ওঠার সময় যখন বলি- আল্লাহু আকবার; এর হিকমত ও রহস্য হল, এই কথার স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, আমি তো উপরে উঠছি, কিন্তু আমি বড় না, বড় হলেন আল্লাহ। তো একথা বলতে বলতে আমি উঠি, 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়'।

আবার নিচে নামার সময় বলছি- সুবহানাল্লাহ; এ অনুভূতি নিয়ে নিচে নামছি যে, সকল নীচুতা থেকে আমার আল্লাহ পবিত্র, আমার আল্লাহ পবিত্র।

এভাবে প্রত্যেকটি মাসনূন দুআ মুখস্থ কর এবং এর গভীর মর্ম অনুধাবন করে করে আমল কর।

মসজিদে প্রবেশের আগে এর সুন্নতগুলো খেয়াল করে আদায় কর এবং দুআ পড়। বিসমিল্লাহ পড়, তারপর দরূদ শরীফ পড়, এরপর পড়-

اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

এবং নফল ইতিকাফের নিয়ত কর।

## প্রতিটি কাজে সুন্নতের ইহতিমাম কর

প্রত্যেক কাজে সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দী কর। সুন্নতের পাবন্দী করলে কী হবে? আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ.

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে মাহবূব বানাতে চাও, আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে মাহবূব বানিয়ে নেবেন।

আল্লাহু আকবার! কত বড় কথা! আমি আল্লাহকে আমার মাহবূব ও প্রেমাষ্পদ বানাতে চেয়েছি আর তাঁর নবীর সুন্নতের অনুসরণ করেছি, এর কত বড় পুরস্কার আল্লাহ আমাকে দিচ্ছেন! আল্লাহ আমার মাহবূব তো হবেনই, শুধু এতটুকুই না, আল্লাহ আমাকেও তাঁর মাহবূব ও প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেবেন।

## আমলের দ্বারাই জীবন গঠন হয়

এতক্ষণ যা কিছু বলা হল, যদি এর মধ্যে আমলের কিছু পাও, তো আমল কর।

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی + یہ خاکی اپنی فطرت مں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

আমল করতেই হবে। আমলের বিকল্প নাই। আমলের দ্বারাই জীবন তৈরি হয়। জীবন গঠন হয়। এ ব্যাপারে কোনো ছাড়ের সুযোগ নেই। কোনো গাফলতের অবকাশ নেই। সুসতী ও অলসতার কোনো স্থান নেই। বারবার একথা ভাবতে হবে, আমাকে আমলের দ্বারাই তৈরি হতে হবে। আমার জন্য আমলের কোনো বিকল্প নেই।

## তোমার চেহারায় যেন ফুটে থাকে- তুমি 'তালিবুল ইলম'

তালিবুল ইলমের চেহারা দেখলেই যেন বুঝে আসে যে, সে তালিবুল ইলম। ইলমের সে তালেব। ইলম শেখার জন্যই সে এসেছে। চলাফেরা ওঠাবসা সর্ব হালতে তাকে দেখলেই যেন বুঝে আসে, সে ইলম তালাশ করছে, ইলম হাসিল করার জন্য বেচাইন হয়ে আছে। তালিবুল ইলমের একটা মিনিট সময় ইলমের তলব ছাড়া অন্য কোনো কাজে খরচ হতে পারে না।

ইলম অথবা ইলম পাওয়ার জন্য যা কিছু লাগে, যেমন, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও দুআ-মুনাজাত, এগুলো ছাড়া বেহুদা একটা কাজও একজন তালিবে ইলম করতে পারে না। বেহুদা কাজে তার একটা মিনিটও নষ্ট হতে পারে না।

## ইলমেদ্বীন শেখার উদ্দেশ্য সার্টিফিকেট হতে পারে না

নতুন এক 'মরয' (রোগ) দেখা দিয়েছে অনেক তালিবুল ইলমের মধ্যে, তারা আলিয়ায় পরীক্ষা দেয়। কেন ভাই! তুমি আলিয়ায় পরীক্ষা দিয়েছ কেন? বলে যে, সার্টিফিকেটের জন্য, চাকরির জন্য। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তুমি কার চাকরি করবে? ইলম শিখে তুমি কার গোলামী করবে?

এটি একটি রোগ। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয়ে গেছ, খেয়াল করে শুনে রাখ, এটি দুনিয়া। এটি খালেস নিয়ত না। ইলম তো এমন এক জিনিস, যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই শিখতে হয়।

জুমার খুতবায় এ হাদীসটি পড়া হয়-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي رِيحَهَا.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনীয় ইলম শুধু এজন্য অর্জন করে যে, এর দ্বারা দুনিয়ার কিছু বিষয় অর্জন করবে, সে জান্নাতের খোশবুও পাবে না। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

## তুমি তোমার উস্তাযের নাজাতের যরীআ হও

আমাদের আকাবির-আসলাফের মধ্যে অনেকের থেকেই এমন কথা বর্ণিত আছে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে ধরা পড়ে গেলে তারা তাদের অমুক অমুক তালিবে ইলমকে দেখিয়ে দিয়ে বলবেন যে, আল্লাহ! আমার কোনো আমল নেই। আমি কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি। আমি আমার এই তালিবে ইলমকে তৈয়ার করে এনেছি। এটাই আমার আমল। এ ছাড়া পেশ করার মতো আমার কিছুই নেই।

আমি তোমাদের বলি, তোমরাও চেষ্টা কর, তোমাদের উস্তাযগণের জন্য এমন তালিবে ইলম হওয়ার। তোমাদের উস্তাযগণও যেন তোমাদেরকে তাদের নাজাতের যরীআ হিসেবে আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারেন। এমন তালিবে ইলম হয়ো না যে, তোমাদের কারণে তোমাদের উস্তাযরা লজ্জিত হন। আল্লাহ তোমাদেরকে কবুল করুন- আমীন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাদরাসায় এনেছেন ভাগ্যবান বানানোর জন্য; দুর্ভাগা বানানোর জন্য নয়। সুতরাং আমাদের কাজ হল, এ নিআমতের কদর করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যতটুকু ভাগ্যবান বানাতে চাচ্ছেন, আমরা যেন সেই পরিমাণ ভাগ্যবান হতে পারি, সেভাবে আমরা দুআ করব, মেহনত করব।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন- আমীন।

## ইলমের প্রকারভেদ

ইলম দুই প্রকার। যথা –
(১) ইলমে শরয়ী,
(২) ইলমে গাইরে শরয়ী।

**ইলমে শরয়ীর হুকুম** : প্রয়োজন অনুপাতে শরয়ী ইলমের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যে ইলম ছাড়া ফরয আদায় করা যায় না, তা শিক্ষা করা ফরজ। যেমন - অজু, নামায ইত্যাদি। এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।
-মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদীসটি সাবেত না থাকলেও অর্থ সহীহ।
আবার যেসব বিষয় জানা ছাড়া ওয়াজিব আদায় হয় না, সেসব বিষয় জানা ওয়াজিব। এমনিভাবে হালাল হারাম খানাপিনার বিষয়ে জানাও ফরজ।

**দ্বিতীয়ত** : কিছু কিছু ইলম শেখা ফরযে কেফায়া, ইকামতে দ্বীনের জন্য যেসব বিষয় জরুরী। যেমন- কুরআন হিফজ করা, হাদীস, ফেকাহ, উসুলে ফেকাহ, নাহু, সরফ, ইলমে লোগাত ইত্যাদিতে পারদর্শিতা অর্জন করা।
ফরজে কেফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেউ কেউ শিখে নিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়; সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে

সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।

-শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

কিছু ইলম নফল পর্যায়ের ; যেমন - উসুলে আদিল্লায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা। এমনিভাবে ফরজে কেফায়ার বাইরে পারদর্শিতা অর্জন করা।

**ইলমে গাইরে শরয়ী** : ইলমে গাইরে শরয়ী হলো, পার্থিব প্রয়োজনে যা শেখা হয়, যা ছাড়া পার্থিব প্রয়োজন পূরণ হয় না। যেমন- চিকিৎসা শাস্ত্র, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য যা জরুরী ; গণিত-শাস্ত্র, যা লেনদেনের জন্য জরুরী। তবে চিকিৎসা -শাস্ত্রে বা গণিত -শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা – যা ছাড়াও চলে – মুস্তাহাব।

আবার কিছু ইলম শেখা হারাম; যেমন- জাদুটোনা ও ভেলকিবাজি ইত্যাদি।

{সংগৃহীত :আল মউসুয়াতুল ফেকহিয়্যাহ খন্ড ২৯ পৃষ্ঠা ৭৭; তালিবে ইলমের জীবন গঠন:৩০}

## ফরজে আইন পরিমাণ ইলমের পরিচয়

পূর্বের আলোচনা থেকে বোজা গেলো, যে ইলম অর্জন করা মুকাল্লাফ তথা মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান সকলের উপর ফরজ। আর তা এমন ইলম, যা অর্জন করা ছাড়া বান্দার জন্য তার উপর আরোপিত ওয়াজিবগুলো আদায় করা অসম্ভব। এই সংজ্ঞাটি ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ-র ‘ফরজে আইন ইলম’ বিষয়ক সংজ্ঞা থেকে আহরিত।

ইমাম নববি রহ. বলেন: "শরিয়তের ফরজে আইন ইলম হলো, যা অর্জন ব্যতিরেকে মুকাল্লাফ ব্যক্তি তার উপর আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে অক্ষম" {নববি রচিত আল-মাজমুয়া}

এটাই পছন্দনীয় সংজ্ঞা। তবে আলেমগণ এ ছাড়া আরও কিছু সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ব্যখ্যা একটি, তিনি উল্লেখ করেছেন:

"এমন সাধারণ ইলম, যা বিবেক সহজেই গ্রহণ করতে পারে, অজ্ঞতা এতে বাধ সাধে না। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অর্পিত রমজান মাসের রোজা, সামর্থ্য হলে বাইতুল্লাহর হজ সম্পন্ন করা , সম্পদের যাকাত দেওয়া। এছাড়া রয়েছে জিনার নিষিদ্ধতা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, চুরি করা ও মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকা এবং এজাতীয় আর যেসব ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড রয়েছে, তাতে নিষিদ্ধতার বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ যেসমস্ত বিষয়ে বান্দা আদেশপ্রাপ্ত, তন্মধ্যে কিছু তারা বুঝবে, জানবে, সশরীরে পালন করবে এবং সম্পদ থেকে আদায় করবে আর কিছু আছে নিষেধমূলক বিধান, যা থেকে তারা বিরত থাকবে" {আর-রিসালাহ:৩৫৭}

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ফরজে আইন ইলম সম্পর্কে বলেন:

"প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সমসাময়িক এমন ইলম অর্জন করা ফরজ, যার থেকে অজ্ঞ থাকার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন– ইলম অন্বেষণ ফরজ - এর ব্যাখ্যা হল, ব্যক্তির দ্বীনি কোনো বিষয়ে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া, যাতে জিজ্ঞেস করে সে বিষয়ে জেনে নিতে পারে"

তার আরেক ব্যাখ্যায় রয়েছে: তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কী ধরনের ইলম শিক্ষা করা মানুষের উপর ওয়াজিব? তিনি বলেন, না-জেনে কোনো কাজের পদক্ষেপ নেবে না, বরং (প্রথমে)জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে। এই ধরনের ইলমই মানুষের জন্য শিক্ষা করা আবশ্যক।

আর উপর্যুক্ত সমস্ত আলোচনা খতিব বাগদাদি রহ. তার *আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালেক রহ. ফরজে আইন ইলমের পরিচয়ে বলেন:

“ লক্ষ কর, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কী প্রয়োজন পড়ছে এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কীসের দরকার হচ্ছে? সেটাই গ্রহণ করে নাও। অন্যকিছু এর উপর প্রাধান্য দিয়ো না”
{আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ}

আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ফরজে আইন ইলমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

তাকে এক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ইলমের পরিমাণ কী হবে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, “যেই পরিমাণ ইলম দ্বারা সে সালাত আদায় করে, দ্বীনের অন্যান্য বিষয় তথা রোজা ও যাকাতের বিধান পালন করে। এবং তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, ওই ব্যক্তির জন্য উচিত এই বিষয়গুলোও জেনে নেওয়া”
{প্রাগুক্ত}

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:
ফরজে আইন ইলম হল, “আল্লাহ কীসের আদেশ করেছেন এবং কীসে বিরত থাকতে বলেছেন- এ বিষয়ে প্রত্যেকের অবগতি লাভ করা”

{মাজমাউল ফাতওয়া:২৮/৮০}

## ইলম ফরজ হওয়ার দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَ رَسُولِهِۦ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না” - সূরা হুজুরাত : ১
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও যদি তোমরা না জেনে থাক” - সূরা নাহল: ৪৩

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।
-মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

অন্যত্র, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালেক ইবনে হুয়াইরিসকে বলেন:

ارْجِعُوا إِلى أَهْلِيكُم فَعَلِّمُوهُمْ

তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের ইলম শিক্ষা দাও।

ইমাম বুখারি রহ. তার সহিহ কিতাবের একাধিক স্থানে হাদিসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যেমন, আযান অধ্যায়ে ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি মালেক ইবনে হুয়াইরিস থেকে নকল করেন;

মালেক বলেন : 'আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলাম। আমরা সবাই ছিলাম যুবক। প্রায় বিশ রাত্রি তার নিকট অবস্থান করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দয়ার আধার। তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও, তবে দেশবাসীকে ইলম শিক্ষা দিবে,তাদের সালাতের আদেশ করবে ;সময় বলে দিবে যে, এই সালাত এই সময় পড়বে। যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে, তোমাদের একজন আযান দিবে, তোমাদের মধ্য থেকে যে সবচেয়ে বড়, সে সালাতের ইমামতি করবে'{সহিহ বুখারি-৬৮৫}

আরেক রেওয়াতে আছে,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– 'তোমরা স্বজনদের কাছে ফিরে যাও। তাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করো,ইলম শিক্ষা দাও এবং শিখতে আদেশ করো'{সহিহ বুখারি-৬৩১}

আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

احْفَظُوه و أخبرُوا من ورائكم

তোমরা হৃদয়ে ঈমান ধারণ করো এবং যারা অনুপস্থিত, তাদের কাছে পৌঁছে দাও (বুখারি)

মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, তিনি তাদের ঈমানের ব্যাখ্যায় যে ইলম শিক্ষা দিলেন, তা যেন তারা সংরক্ষণ করে এবং নিজ গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়।

## আল্লাহর নিকট ইলমের মর্যাদা

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত প্রথম শব্দ- "اقرأ" মানে "পড়ো"। আল্লাহ প্রথমেই পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এতেই বুঝা যায়, আল্লাহর কাছে ইলমের মর্যাদা কতবেশি। তিনি আরো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নির্দেশ দিতে পারতেন। তাওহীদের নির্দেশ দিতে পারতেন। এটা ছাড়া তো ঈমান লাভ হয়না; আর ঈমান ছাড়া কেউ জান্নাত লাভ করতে পারবে না। রিসালাতের নির্দেশ দিতে পারতেন, যা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আখিরাতের কথা বলেন নি। যেই আখিরাতের ভয়েই মানুষ নেক আমলের অগ্রসর হয়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। বলেন নি 'নামায পড়ো'। নামায কত বড় ইবাদত। এটা বান্দাকে তার রবের সাথে জুড়ে রাখে, অশ্লীলতা থেকে বাঁচায়, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। বা, বলেন নি, রোযা রাখো। যেই রোযা আল্লাহ নিজের জন্য বলেছেন, নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। জিহাদ করতেও বলেন নি, যার বিনিময় জান্নাত। আল্লাহ সবকিছু রেখে সর্বপ্রথম "পড়ার" নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেলো, এ উম্মতের মাঝে ইলমের চর্চা হবে বেশি।

## কুরআন কারীমে বর্ণিত ইলমের ফজিলত

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে'। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআ'হ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰی اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা আ. ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আলিমের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

## হাদীস শরীফে বর্ণিত ইলমের ফজিলত

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না?

ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব।
-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন।
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না।

**এক.** আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। **দুই.** যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়।

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ.

"যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।"

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে।

-আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও **আল্লাহর রাস্তা** বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।

-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস **১৬৩১**

আরো ইরশাদ হয়েছে,

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

## আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে আকাবির তথা পূর্বসূরিদের চমৎকার সব বাণী পাওয়া যায়।

**এক.** হযরত ঈসা আ. বলেন:

مَنْ تَعَلَّمَ وَ عَمِلَ فَذَاكَ يُدْعي في مَلَكُوتِ السَّماءِ.

'যে ইলম হাসিল করে এবং এর ওপর আমল করে, আসমানের রাজ্যে তাকে মহামনীষী হিসেবে ডাকা হয়'

-আল জামে লি আখলাকির রাবী **১৭**

**দুই**. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন:

مَثَلُ العُلَمَاءِ فِيْ النَّاسِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّماءِ يُهْتَدِي بِهَا

'আসমানে তারকারা যেমন যমিনে আলেমগণও তেমন; তাদের মাধ্যমে হেদায়েত পাওয়া যায়'

অর্থাৎ তারকারা হলো আসমানের সৌন্দর্য আর আলেমগণ হলেন যমিনের সৌন্দর্য।

**তিন.** হযরত আবু বকর বদরী বলেন:

আমি একবার সাহল ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট গেলাম। আমার হাতে কলম দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি লেখালেখি করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, কিছু কিছু লিখি। তখন তিনি বলেন, দোয়া করি, মৃত্যুর সময় যেন তোমার হাতে কলম থাকে।

মনীষীগণ বলেন:

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إلى اللَّحْدِ

'ইলম অন্বেষণ করো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত'

অর্থাৎ সারাজীবন ধরেই কিছু না কিছু শিখতে থাকো।

**চার.** ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী রহ. বলেন:
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাওহীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সাথে আলেমদেরকেও সাক্ষী রেখেছেন–

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও' - সূরা আল ইমরান:১৮

আল্লাহর বিধানমতে অবিশ্বস্ত কেউ সাক্ষী হতে পারে না।তো বোঝা গেলো, আলেমগণ আল্লাহর নিকট বিশ্বস্ত এবং সাক্ষীর উপযুক্ত।

**পাঁচ.** ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন:

النَّاسُ إِلى العِلْمِ اَحْوَجُ مِنْهُم إِلى الطَّعَامِ والشَّرَابِ لأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتاجُ الى الطَّعَامِ والشَّرابِ فَي اليَومِ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ وَ حَاجَتُهُ اِلى العِلْمِ بِعَدَدِ أَنْفاسِه.

' মানুষ খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে ইলমের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কেননা খাদ্যের প্রয়োজন হয় দিনে দু'একবার। পক্ষান্তরে ইলমের প্রয়োজন পড়ে প্রতি-মুহূর্তে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে'।

**ছয়.** হযরত আলী রা. তার এক শাগরেদকে লক্ষ্য করে বলেন:

يا كُمَيْل! الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ المَالِ, العِلْمُ يَحْرِسُكَ وَاَنْتَ تَحْرِسُ الْمَالَ, وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْه, وَالمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالعِلْمُ يَزْكُوا بِالْإِنْفَاقِ.

'হে কুমাইল, ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কারণ ইলম তোমাকে নিরাপত্তা দেয় আর সম্পদের নিরাপত্তা তোমাকে দিতে হয়। আলেমগণ শাসক আর ধনীরা শাসিত। সম্পদ খরচ করলে কমে আর ইলম শেখালে বৃদ্ধি পায়' - ইহইয়াউল উলুম ১৪

তিনি অন্যত্র বলেন:

العِلْمُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ القَائِمِ المُجَاهِدِ وَاِذا مَاتَ العالِمُ ثَلِمَ مِنَ الإسْلامِ ثُلْمَةً لا يَسُدُّها اِلَّا خَلَفٌ مِنْهُ

'আলেমগণ রোজাদার, তাহাজ্জুদগুজার ও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণের চেয়ে উত্তম। কেননা কোনো আলেম মারা গেলে ইসলামে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয় অন্য একজন আলেম দ্বারাই তা পূরণ হতে পারে' – ইহইয়াউল উলুম ১৪

তিনি আরো বলেন:

رَضِيْنا بِقِسْمَةِ الجَبَّارِ فِيْنا ☆ لَنا عِلْمُ وَلِلْاَعْداءِ مَال
فَاِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيْبٍ ☆ وَاِنَّ العِلْمَ بَاقٍ لا يَزَالُ

'মহান আল্লাহ পাকের বন্টনে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের ভাগে পড়েছে ইলম আর শত্রুদের ভাগে পড়েছে সম্পদ। সম্পদ তো অতি দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আর ইলম বাকি থাকে চিরকাল'

সম্পদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম সর্বদা বাকি থাকে। যার কাছে ইলম আছে তার অন্যকিছু চাই না — না বন্ধু- বান্ধব, না আত্মীয় -স্বজন। কোনো রাজা-বাদশা এতটা শান্তি-স্বস্থি পায় না আলেমগণ যতটুকু পেয়ে থাকেন। কারণ, বাদশাদের তো নিজেদের পরিমণ্ডলেও সদা সতর্ক থাকতে হয়, কোথাও তারা নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে একজন আলেমকে নির্জন জঙ্গলেও সতর্ক থাকতে হয় না, সবখানেই তারা নিরাপদ।

**সাত.** হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন:

‘ আমি একবার ইমাম মালেক রহ. -এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ কাগজ কলম রেখে নফলে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করলে তিনি বলেন, যে কাজ থেকে উঠে নফলে দাঁড়ালে সে কাজই উত্তম ছিল।

**আট.** ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন:

طَلَبُ العِلْمِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَوةَ النَّافِلَةِ

‘আমার নিকট ইলমী শুগোল নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম’
- আল মাজমু’

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রা. বলেন একই কথা–

فَضْلُ العِلْمِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبادَةِ

'আমার নিকট ইলমের ফযীলত ইবাদতের চেয়ে প্রিয়’
- জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৩৯

**নয়.** হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন:

كُنْ عالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُحِبًّا اَوْ مُتَّبِعًا وَ لا تَكُنْ خامِسًا فَتَهْلَك

' হয় আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও ; নয় তাদের মহব্বত করো, নয় তাদের অনুসারী হও ; অন্যকিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য’

- জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৪৬

হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন:

আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. -কে বললাম, যদি পারো আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও। তাও যদি না পারো তাহলে তাদের মহব্বত করো, হিংসা করো না। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. বলে ওঠেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের জন্যও সুযোগ রেখেছেন।

**দশ .** হযরত আবু বকর আজরী রহ. বলেন:

আলেমদের ফযীলত সর্বাবস্থায়। ঘর থেকে বের হতেই তা শুরু হয় এবং প্রতি পদে পদে হাসিল হয়। ইলমী মজলিশে বসা, মুযাকারা করা, দরস-তাদরীস সবই অতীব ফযীলতের কাজ। ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কাজই অত্যধিক ফযীলত রাখে।

**এগারো.** হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. যখন খলিফা হন একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হলো, এখন তো মাশাআল্লাহ দেশজুড়ে বড় বড় আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস -মুফাসসির আছেন; তাদের অবর্তমানে দেশের কী অবস্থা হবে? তাই তিনি ইলম সংরক্ষণের চিন্তা করেন এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট এ মর্মে চিঠি লিখেন। তেমনি এক চিঠি তিনি লিখেছেন ইমাম ইবনে হযমের নিকট। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. তাকে লিখেন–

أُنْظُرْ ما كانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ و سَلَّمَ فاكْتُبْه فِإنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَ ذِهابَ العُلَماءِ وَ لا تَقْبَلْ اِلَّا حَدِيْثَ النَّبِيِّ وَ لتُفْشُوا العِلْمَ وَ لِتُجْلِسُوا حَتّى يَعْلَمَ مَنْ لا يَعْلَمْ

' তুমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর হাদীসগুলো খুঁজে খুঁজে লিখে নাও। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, আলেমদের প্রস্থানে ইলমও মিটে যাবে। শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর হাদীসগুলোই জমা করবে। পরে সেগুলো প্রচার -প্রসারের ব্যবস্থা করবে। দীর্ঘ দীর্ঘ মজলিশ কায়েম করবে যাতে মূর্খরাও শিখে নিতে পারে' – আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন ২৪৪

**বার.** এক বুযুর্গ বলেন:

الْجاهِلُ صَغِيْرٌ وَاِنْ كانَ شَيْخًا وَالعَالِمُ كَبِيْرٌ وَاِنْ كَانَ حَدَثًا

'মূর্খ বয়সী হলেও ছোট আর আলেম কম বয়সী হলেও বড়'

এর প্রমাণে এক কবি বলেন:

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ المَرْءُ يُولَدُ عالِمًا ☆ وَلَيْسَ اَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جاهِلٌ
وَاِنَّ كَبِيْرَ القَومِ لا عِلْمَ عِنْدَهُ ☆ صَغِيْرٌ اِذا اِلْتَفَتَ اِلَيْهِ المَحَافِلُ

'তোমরা বেশি বেশি পড়ো, কেননা কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না। আলেম কখনো জাহেলের সমান নয়। নেতার যদি ইলম না থাকে তাহলে সে ছোট, যখন তারা কোথাও সমবেত হয়' -আর রিহলা ফি তলাবিল হাদীস ৬

**তের.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওন বলেন:

‘ তিনটি জিনিস এমন যা আমি নিজের জন্য এবং আমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করি। প্রথমত হাদীস শেখা এবং শেখানো। দ্বিতীয়ত কুরআন শেখা এবং শেখানো। তৃতীয়ত ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করা।’

**চৌদ্দ.** হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-কে মু'আল্লিম হিসেবে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানে পাঠান, তখন ইলমের ফযীলত সম্পর্কে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, ইলম শেখো; কেননা যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম শেখে তার জন্য তা খোদাভীতির কারণ হয়। ইলম শেখাও ইবাদত। ইলমের তাকরার ও মুযাকারা আল্লাহর নিকট তাসবীহতুল্য। পরস্পর মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা জিহাদতুল্য। আর মূর্খকে ইলম শেখানো সদকাতুল্য। যোগ্য লোককে ইলম শেখানো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। কেননা এর মাধ্যমে হালাল-হারাম চেনা যায়। ইলম মানুষের একাকিত্বের বন্ধু, দুঃখ-দুর্দশায় পথপ্রদর্শক ; চরিত্র সংশোধনের মাধ্যম, গরীব-দুঃখীর সাথে মেশার উপায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মর্তবা বুলন্দ করে দেন। অবিসংবাদিত নেতা ও সমাজ সংস্কারক

বানিয়ে দেন। তাদের সিদ্ধান্ত হয় সঠিক সিদ্ধান্ত। ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়। সমুদ্রের মাছ থেকে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত তাদের মাগফিরাতের জন্য দুয়া করে। মৃত আত্মার জন্য ইলম সঞ্জবনী সুধা, অন্ধকারের আলো এবং দুর্বলের হাতিয়ার। ইলমের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতা পায়, সমাজে প্রভূত সম্মান লাভ করে। আখিরাতে পায় উঁচু মাকাম। ভাগ্যবানরাই লাভ করে ইলমের নেয়ামত। দুর্ভাগারা বঞ্চিত হয় ইলমের নেয়ামত থেকে। -জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৭৭;

## তালিবে ইলমের পরিচয়

ইমাম নববী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মাজমু'- এর ভূমিকায় লেখেন,

তালিবে ইলমের পরিচয় হলো:

'তার হিম্মত হবে উঁচু, বেশির সম্ভাবনা থাকলে অল্পে তুষ্ট হবে না।
কাজের বেলায় কোনো প্রকার অবহেলা করবে না।
সম্ভবপর প্রতিটা সুযোগ হাতড়ে নেবে, অন্য সময়ের জন্য রেখে দিবে না।
যদিও পরে সুযোগ পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সে আশায় বসে থাকবে না।
কেননা, বিলম্বের পথে বাধা-বিপত্তি অনেক। তখন অন্যকিছু শেখার সুযোগ থাকে।' –কিমাতুয যামান ৬৯

## ছাত্রজীবনের গুরুত্ব

**মুফতী আ'জম পাকিস্তান, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলেন–**

মাসনূন খোতবার পর

আমি কী করব! নিয়ত তো ছিল প্রতি সপ্তাহেই আমি আমার তালিবুল ভাইদের নসীহত করব। কিন্তু রোগ-ব্যাধি এবং অন্যান্য চিন্তা ও পেরেশানী একের পর এক লেগেই আছে। একারণে গত তিন সপ্তাহ ধরে উপস্থিত হতে পারিনি। আজ অনেকদিন পর আপনাদের সাথে বসতে পেরেছি।

لكل شيء آفة و للعلم آفات

একথা শৈশবে কোথায় যেন শুনেছি। এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবন্ধকতা তো সব কাজেই থাকে কিন্তু ইলমের পথে প্রতিবন্ধকতা থাকে সবচেয়ে বেশী। আজ সেসকল প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি। মনে একটুও শান্তি নেই। সারাক্ষণ একটার পর একটা চিন্তা লেগেই থাকে।

## জীবনের মূল্য

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

আমি সব সময় যে কথাটি বলে এসেছি এবং এখনো যে কথাটি বলতে চাচ্ছি- তা হল, সময়ের মূল্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। সময় আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেআমত। এ নেআমত একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। সময় অতিবাহিত হচ্ছে। সময় প্রবাহিত হচ্ছে।

আপনার দৃষ্টান্ত হল বরফ-বিক্রেতার মত। বরফ বিক্রেতার মূলধন সারাক্ষণ নিঃশেষ হচ্ছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন, বরফের দোকানে গিয়ে আমার সূরা আসরের হাকীকত বুঝে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

‘‘সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।’’

বুযুর্গ বলেন, মানুষ যে কীভাবে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, আমি বরফের দোকানে গিয়ে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি। বরফ ব্যবসায়ীর মূলধন সারাক্ষণ গলে গলে শেষ হতে

থাকে। কেউ কিছু কিনলেও শেষ হয়, না কিনলেও হয়। তবে যা বেচা হল, তার বিনিময়ে অর্থ আসে। আর যা বেচার আগেই গলে যায় তার বিনিময়ে কোনো অর্থ আসে না।

মানুষের জীবন সম্পূর্ণই বরফের মত। প্রতি নিঃশ্বাসে একটি করে মুহূর্ত বিয়োগ হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবন ছোট হচ্ছে। মানুষ বলে বয়স বাড়ছে। মাশাআল্লাহ সত্তর বছর হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব কথা হল, যার যত বয়স বাড়ছে তার হায়াত তত কমছে।

আমরা ছোট বেলায় একটি কবিতা পড়েছি-

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی
گردوں نے گھڑی عمرکی اک اور گھٹا دی

"হে উদাসীন! ঘড়ির কাটা তোমাকে ডেকে ডেকে বলছে। ঘড়ির প্রতিটি সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে একেকটি মুহূর্তকে কমিয়ে দিচ্ছে।"

ঘড়িতে ঘন্টা বেজেছে। এর অর্থ, তোমার জীবন থেকে আরো একটি ঘণ্টা কমে গেল।

## মানুষ এবং ব্যবসা

আমি এখন যা বলছি, তা নিছক কোনো কবির কল্পনা নয়। এটি হাদীসের মর্ম। হাদীসের ছাত্ররাও এখানে আছে। তারা ভালো করেই জানে, হাদীস শরীফে এসেছে-

كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

প্রতিটি মানুষ যখন সকালে বের হয়, তখন সে ব্যবসায়ী হিসেবেই বের হয় এবং ব্যবসার জন্যই বের হয়। কিন্তু কিসের ব্যবসা? কাপড়ের ব্যবসা? না। খাবারের ব্যবসা? না। লোহা এবং তৈজস পত্রের ব্যবসা? না। বরং নিজের জীবনের ব্যবসা, নিজের শক্তি-সামর্থ্য, মেধা, সময় ও শ্রমের ব্যবসা।

তোমরা নিজেদেরকে ব্যবসায় খাটিয়েছ। এই ব্যবসার ফলাফল কী? যদি ব্যবসায়ী সচেতন হয় তাহলে সে আখেরাতের আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাবে। যখন সে ঘর থেকে বের হবে এই নিয়তে বের হবে যে, আমি একজন সফল ব্যবসায়ী হব এবং অবশ্যই কিছু উপার্জন করে নিয়ে আসব। আর প্রকৃত লাভ তো আখেরাতের লাভ। যদি সে আখেরাতের আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে তাহলে সে সফল। আর যদি বাঁচাতে না পারে তাহলে নাকাম, ব্যর্থ।

হাদীসের শব্দ হল,

فمعتقها أو موبقها-

হয়ত সে নিজেকে আযাদ করে নেবে অথবা ধ্বংস করে দেবে।

মানুষ যখন সকালে বের হয় তখন সে ব্যবসার পণ্য নিয়ে বের হয়। তার পণ্য হল তার জীবন। এই জীবন প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে ছোট হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে যৌবন দান করেছেন। সুস্থতা দান করেছেন। হাত পা চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ রেখেছেন। যদি এখনো এসবের মূল্য বুঝে না আসে তাহলে আমার অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

## ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা

আপনাদেরকে এখন যা বলব তা আমার মনের কথা। আমার হৃদয়ের বন্ধন তো আপনাদের সাথে। আপনারাই আমার শষ্যক্ষেত্র আমার আপনজন। আপনাদেরকে ঘিরে আমার জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া। আমার মনে চায়, প্রতিদিন আপনাদের সাথে কথা বলি, সাক্ষাৎ করি। আপনাদের মনের কথা শুনি এবং আমার মনের কথা বলি। কিন্তু আমি অক্ষম। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। জীবনের সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে গেছে।

এখন আগের মত চলাফেরা করার শক্তি নেই। কখনো সুযোগ হয় কথা বলার, আবার কখনো সুযোগ হয় না। এখন আমি মাযূর হয়ে গেছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ এটাই-

من نہ کردم شما حذر بکنیم
অর্থ: আমরা কিছু করতে পারলাম না। তোমরা কিছু করার চেষ্টা কর।

যদি আপনারা জীবনকে মূল্যায়ন না করেন তাহলে একদিন ভুগতে হবে। সুতরাং সময়কে মূল্য দিন। কিছু করার, কিছু হওয়ার এখনই সময়। যৌবন হচ্ছে জীবনের বসন্তকাল। আল্লাহ আপনাদের এ যৌবন দান করেছেন। যদি ভাল হতে চান তাহলে মনে রাখবেন, ভাল হওয়ার এখনই সময়। আবার যারা খারাপ হয় তারা এই বয়সেই খারাপ হয়।

## ভালো কিংবা খারাপ হওয়ার সময়

আমাদের অনেক তালিবুল ইলম উদাসীনতায় ডুবে আছে। তারা মনে করে, এখনও তো ছাত্র। ছাত্রজীবন স্বাধীন জীবন। কর্মজীবনে যখন প্রবেশ করব তখন সব করব। কিন্তু বাস্তব কথা হল, যে এখানে ঠিক হবে না, সে কোথাও ঠিক হবে না।

আল্লাহ তাআলার কুদরতে তো সবকিছুই হতে পারে। আল্লাহ চাইলে সত্তর বছরের কাফেরকেও এক মুহূর্তে ওলী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করা তো কুফর। কিন্তু সুন্নাতুল্লাহ এই যে, ইলমের মুসাফিরদের জন্য ছাত্রজীবনই হচ্ছে ভালো কিংবা মন্দ হওয়ার সময়। আলিমে দ্বীন হতে চাও, মুহাক্কিক হতে চাও- সব এই সময়ের মধ্যেই হতে হবে। আপনারা আমাকে টুকটাক যা কিছু করতে দেখেন সবই ছাত্রজীবনের মেহনতের বরকত। আল্লাহর শোকর ছাত্রজীবনে আমি কখনো সময় নষ্ট করিনি।আলহামদুলিল্লাহ ছাত্রজীবনকে আমরা ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছি।

ছাত্রজীবনে আমাদের পার্থিব কোনো কিছু হাসিল করার চিন্তা ছিল না, সাংসারিক কোনো ঝামেলা ছিল না। কারো সাথে দোস্তী কিংবা দুশমনীও ছিল না। কোনো সভা-সমাবেশে যোগদানের ফিকিরও ছিল না। ছাত্রজীবনে কিতাব মুতালাআ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ উস্তাদজীবনে ছাত্রজীবনের সেই মেহনতের সুফল অনুভব করতে পেরেছি। ছাত্রজীবনের মেহনতের মাধ্যমে যে যোগ্যতা হয়েছিল, মুতালাআর দ্বারা যা আরো বেড়েছিল তা-ই এখনও আমার পুঁজি।

আমার শিক্ষকতার জীবনে কিতাব দেখার প্রয়োজনীয়তা খুব কমই হয়েছে। কারণ ছাত্রজীবনে কিতাবের উপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল। ফলে শিক্ষকজীবনে দরসী কিতাবে খুব বেশী সময় দিয়ে মুতালাআর প্রয়োজন হত না। হ্যাঁ, সাধারণ পড়াশোনা অনেক হত।

তো ভাই! আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আপনাদের পড়াশোনার গোটা সময় এটা। যদি এই সময়কে কাজে না লাগান তাহলে জীবনভর কাঁদতে হবে। তারপরও কোনো লাভ হবে না। যে সময় গত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আর এ জগতে সম্ভব নয়।

ফিরে আসি মূল আলোচনায়। আমি একটি আয়াত পড়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, আজকের মজলিসে অন্তত এই আয়াতের  তাফসির স্পষ্ট হয়ে যাক। কিন্তু সময় অনেক চলে গেল।  তোমাদের কি মনে আছে,  আমি কী বলছিলাম? আমার স্মৃতিশক্তি ধীরেধীরে কমে যাচ্ছে। কিছুই আর আগের মত মনে থাকে না। আমি এই আয়াতটি পাঠ করেছিলাম-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

এটা কুরআনের বালাগাতের পূর্ণাঙ্গতা যে, এই আয়াতে সবকিছু এসে গেছে। এই আয়াতে আমাদের পূর্ণ নেসাব এসে গেছে। একজন আলিম, একজন শিক্ষক ও একজন দায়ীর নেসাবে যিন্দেগী এবং মানযিল কী হবে, সবই এসে গেছে। একজন তালিবুল ইলম তার ছাত্রজীবনের শুরু থেকে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কীভাবে কাটাবে সব কিছুই রয়েছে এই আয়াতে।

# লক্ষ্য অর্জনের প্রতি একাগ্রতা

দ্বীনী ইলমের উদ্দেশ্য কখনো শুধু পড়া নয়, বরং দ্বীনী প্রজ্ঞা তথা 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জন করা। কুরআনের দাবী হল, সর্বদা এমন জামাত থাকতে হবে যারা 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জনের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দেবে। এই জামাতকে মুজাহিদ ও গাযীদের জামাত থেকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনারা জানেন,

ذروة سنام الدين الجهاد

অর্থাৎ, জিহাদ হচ্ছে দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া।

ইসলামে জিহাদের অনেক গুরুত্ব। জিহাদের সওয়াবের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু তালিবুল ইলমদের তা থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। কিছু লোক শুধু এই কাজের জন্য ফারেগ হয়ে যাবে। তারা আর কোনো কাজ করবে না। কারণ দ্বীনী প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিমে দ্বীন সকলেই এ ব্যাপারে একমত এবং অভিজ্ঞতাও একথার সাক্ষ্য দেয় যে, জিহাদ ও ইলম দ্বীনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন চূড়া এবং দুটো কখনোই একসাথে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়।

ইলম তো কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন এর সাথে অন্য কোনো ব্যস্ততা না থাকে। তালিবুল ইলমের অন্তর জুড়ে থাকবে শুধু ইলমের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা। যখন সে নিজের সময়, শক্তি-সামর্থ্য, মেধা ও শ্রম পূর্ণরূপে ইলমের পেছনে ব্যয় করবে তখন হয়ত তার অল্প পরিমাণ ইলম অর্জিত হবে।

ছাহেবে হিদায়ার শাগরিদ আল্লামা যারনুজী রাহ. 'তালিমুল মুতাআল্লিম' কিতাবে লিখেছেন-

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দেবে, ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দেবে না।

এই যখন অবস্থা, তখন তুমি যদি তোমার সকল সময় অন্যান্য কাজে খরচ করে ফেল তাহলে তুমি তো ইলমের ছায়াও দেখতে পাবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা করুন, আপনারা এই কাজের জন্যই এসেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধানাবলী শেখা ও বোঝাই আপনাদের কাজ।

আমি কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনাচ্ছি-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

"প্রত্যেক বড় জামাত থেকে একদল লোক কেন বের হয় না দ্বীনী প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য ?"

মুজাহিদ ও গাযীদের জামাত থেকে আলাদা করে আপনাদেরকে এই কাজের জন্যই বের করা হয়েছে। অর্থাৎ মুজাহিদরা জিহাদে মশগুল থাকবে আর ছাত্ররা মগ্ন থাকবে পড়াশোনায়। কারণ পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজ কখনো একসাথে চলতে পারে না। পড়ালেখা এবং জিহাদও একসাথে চলতে পারে না। যদিও জিহাদ দ্বীনের অনেক বড় কাজ, তারপরও পড়ালেখা ও জিহাদ একসাথে চলতে পারে না। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিহাদকে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেকের উপর জরুরী করে দেননি। বরং একদল করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

## ফরযে কেফায়ার হাকীকত

ফরযে কেফায়া হল এমন কাজ যা জরুরী বটে কিন্তু সকলের একসাথে তাতে অংশগ্রহণ করা জরুরী নয়। এখানে কর্মবণ্টননীতি অবলম্বন করতে হয়। কেউ এই কাজ করবে আর কেউ সেই কাজ করবে। যাবতীয় ফরযে কেফায়া কাজের সারকথা এটাই। ফরযে কেফায়া আপন জায়গায় অবশ্যই ফরয। কিন্তু তাই বলে যদি সকলেই সেই কাজে লেগে যায়, তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেবে কারা? তাই কেউ জিহাদ করবে, কেউ দাওয়াতের কাজ করবে, কেউ ইলম শিখবে, কেউ ইলম শেখাবে অর্থাৎ বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজে মশগুল থাকবে। এভাবে দ্বীনের কাজগুলো সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

কুরআনে কারীমের ফায়সালা এটাই সাব্যস্ত করে যে, ছাত্রদেরকে জিহাদ থেকে পৃথক রাখা হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা করুন। জিহাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ তো ইসলামে নেই। ইসলামের পঞ্চম রুকন হচ্ছে জিহাদ। আর এই জিহাদ থেকে ছাত্রদেরকে পৃথক করে বলা হচ্ছে, তোমরা জিহাদে যেও না । বরং তোমরা 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্জন কর। কারণ নিজের সময় শক্তি সামর্থ্য পূর্ণরূপে ব্যয় করা ছাড়া তাফাক্কুহ অর্জিত হয় না।

## তালিবুল ইলম এবং নফল নামায

এটি একটি স্বতসিদ্ধ কথা যে, ছাত্রজীবনে ছাত্ররা পড়ালেখা ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না। কাজ তো কাজ, তারা নফল যিকির শোগল -যা খালেস ইবাদত- আমাদের আকাবিরগণ তো ছাত্রদেরকে সেগুলো থেকেও দূরে রাখতেন।

খোলাসাতুল ফাতাওয়া খুলে দেখুন -খোলাসাতুল ফাতাওয়ার মুসান্নিফ হিদায়ার মুসান্নিফের সমসাময়িক ছিলেন- তাতে এই ইবারত লেখা আছে,

كنا نضرب على أن نسبح التسبيح

বেশী সম্ভব ইবারতটি এমনই হবে। অর্থাৎ ছাত্রযামানায় আমাদের উসত্মাযগণ আমাদের খোঁজখবর নিতেন। যদি দেখতেন আমরা সালাতুত তাসবীহ পড়ছি, তাহলে আমাদেরকে প্রহার করতেন। সালাতুত তাসবীহ নামায কি কোনো গুনাহের কাজ ? বরং অনেক বড় সওয়াবের কাজ। হাদীসে তার ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।
কিন্তু তালিবুল ইলমের জন্য সালাতুত তাসবীহ হল মুতালাআ।

## তালিবুল ইলম এবং বায়আত

হযরত গাঙ্গুহী রাহ. এবং আমাদের অন্যান্য আকাবিরগণ ছাত্র অবস্থায় কাউকে বাইআত করতেন না। ছাত্রদের কেউ বাইআত হতে চাইলে বলতেন, আগে পড়ালেখা শেষ কর। কেননা পড়ালেখা এবং যিকির আযকার একসাথে হয় না।

আমার নিজের কথাই বলি, আমি তখন হিদায়া পড়ি। শাইখুল হিন্দ রাহ. রাজনীতির ময়দানে নেমে আসেন এবং ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে খেদানোর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন আমি একদিন আরয করলাম, হযরত! আমাকে বাইআত করে নিন। হযরত বললেন, যখন ফারেগ হবে, তখন বাইআত করব।

এটা আমার শৈশবের ঘটনা। এসকল আন্দোলন তখন পুরোপুরি বুঝতাম না। রেশমী রুমাল আন্দোলন এবং আরো কত কত আন্দোলন হল! সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে শাইখুল হিন্দ রাহ. এক করে ফেলেছিলেন। হিন্দুস্তান থেকে আফগানিস্তান এবং তুরস্ক পর্যন্ত সব দেশকে এক করে ফেলেছিলেন। সকল মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক প্লাটফর্মে দাঁড় করিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে এমন হয়েছিল যে যদি একযোগে হামলা করতেন তাহলে ইংরেজরা বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু এর আগেই বিশ্বাসঘাতকদের কারণে সব পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। এই বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের মুসলমানরাই করেছে। অবশেষে শাইখুল হিন্দ রাহ. গ্রেফতার হলেন এবং চার বছর মাল্টায় বন্দী থাকলেন।

যাইহোক, আমি বলছিলাম, আমি যখন ছাত্রজীবনে হযরতের কাছে বাইআতের দরখাস্ত করলাম, হযরত আমাকে বাইআত করতে অস্বীকার করলেন। যখন মাল্টার বন্দীজীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন, তখন আবার বাইআত হওয়ার দরখাস্ত করলাম -আমি তখন পড়ালেখা সমাপ্ত করেছি এবং শিক্ষকতা করি- হযরত আমার দরখাস্ত কবুল করলেন।

আমাদের আকাবিরদের অবস্থা এমনই ছিল। তারা নিজেরা সবকিছুই করতেন। কিন্তু ছাত্রদের জন্য কখনো ছাত্র অবস্থায় অন্য  কোনো কাজে মশগুল হওয়াকে পছন্দ করতেন না। আমাকেও শায়খুল হিন্দ রাহ. ছাত্র অবস্থায় বাইআত করেননি কিন্তু ফারাগাতের পর ঠিকই বাইআত করেছেন।

## শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহ.-এর বাইআত হওয়ার ঘটনা

এটা এ যুগের কোনো ঘটনা নয়। এটি অনেক আগের ঘটনা। শায়খ ফরীদুদ্দীন রাহ. অনেক বড় একজন আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তিনি আমাদের চিশতিয়া সিলসিলার অনেক বড় একজন শায়েখ। তিনি মূলতানে পড়ালেখা করেছেন। মূলতান ইলমের শহর হিসাবে

সবসময় প্রসিদ্ধ ছিল। একবার কুতুব বখতিয়ার কাকী মূলতান তাশরীফ আনেন। তাঁর আগমনের খবর শুনে ফরীদুদ্দীন রাহ.-এর ইচ্ছা হল, তাঁর হাতে বাইআত হবেন এবং তিনি গিয়ে বখতিয়ার কাকী রাহ.-কে তার ইচ্ছার কথা জানালেন। বখতিয়ার কাকী রাহ. জবাব দিলেন, তুমি আগে পড়ালেখা সমাপ্ত কর। তারপর দিল্লী আস। আমি তোমাকে বাইআত করব। সুতরাং তিনি তাই করলেন। যখন পড়ালেখা সমাপ্ত হল তখন দিল্লী গিয়ে বখতিয়ার কাকী রাহ.-এর হাতে বাইআত হলেন।

বাইআত হওয়ার পর আল্লাহ তাকে কত উঁচু মাকাম দান করেছেন, তা তার জীবনী পাঠকারী সকলের জানা আছে। আল্লাহ তাকে অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। বখতিয়ার কাকী রাহ.-এর যেসকল খলিফা রয়েছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই।

## সালাফের ছাত্রজীবন

আপনারা বড়দের যে কারো জীবনী পাঠ করুন, দেখবেন ছাত্রজীবনে তার প্রধান ব্যস্ততা ছিল পড়ালেখা। শাইখুল হিন্দ রাহ. যখন মাল্টার কারাগারে বন্দী তখন এক ইংরেজ তার কাছে গিয়েছিল তদন্ত রিপোর্ট তৈরী করার জন্য। শাইখুল হিন্দ রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কী কী পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন? শাইখুল হিন্দ রাহ. একে একে সব পরিকল্পনা বলে দিলেন। কারণ, তখন সবকিছুই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ অফিসারটি মাল্টা থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট দিল, আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এই বৃদ্ধ লোকটি, যার গোটা জীবনই কেটেছে মাদরাসার চার দেয়ালের ভেতরে, যে কখনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি, জীবনের আশিটি বছর যে পড়া পড়ানোর মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে, কখনো কোনো মন্ত্রী-এমপির সাথে সাক্ষাৎও করেনি, কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো রাষ্ট্রদূতের সাথে যার কখনো কোনো মতবিনিময় হয়নি, সে কীভাবে এমন ভয়াবহ নীলনকশা তৈরী করতে পারে! আর কয়টা দিন যদি তারা পেত তাহলে আমাদের পরাজয় ছিল সুনিশ্চিত।

## সাধনা ও একাগ্রতার সুফল

তো শাইখুল হিন্দ রাহ. এসকল কাজ করেছেন ছাত্রজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর। ছাত্রজীবনে ছাত্রজীবনের হক আদায় করেছেন। তখন জানতেনও না, রাজনীতি কোন প্রাণীর নাম? এবং বাইরের দুনিয়ায় কী কী ঘটছে? তাছাড়া শাইখুল হিন্দ রাহ. হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী রাহ.-এর নিকট সফরে-হযরে সর্বাস্থায় ছিলেন। নানুতবী রহ.-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর খেদমতে দু'বছর অতিবাহিত করেন। এ সব কাজ শেষ করার পর তিনি রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হন।

তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন এবং এই ইলমের মধ্যে এই যোগ্যতা রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম চর্চায় মশগুল রাখবে, আল্লাহ তাদের জন্য রাস্তা খুলে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

والذين جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهم سُبُلَنا

"যারা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করব।"

তাই তো শাইখুল হিন্দ রাহ.-কে ইমাম বানানো হয়েছে। অথচ শাইখুল হিন্দ রাহ. সারা জীবনে ইতিপূর্বে কখনো রাজনীতি করেননি। বলতে পারবেন না রাজনীতি কাকে বলে? গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন মাদরাসায় এবং খানকায়। কিন্তু যখন জিহাদের সময় এল, জিহাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশা শুরু করলেন। তখন আল্লাহ তার জন্য রাস্তা খুলে দিলেন।

## ইসলামী সংবিধান এবং পাকিস্তান আন্দোলন

হযরত শাইখুল হিন্দ তো ছিলেন শাইখুলহিন্দ। আমি ছোট মানুষ, আমার কথাই বলি। যখন আমি পাকিস্তান আসি, আপনাদের হয়তো ধারণা, আমি এখানে এসেই একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমি মাদরাসা পরিচালনাকারী একজন হুযুর'। কিন্তু না।

আমি এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসিনি। আমি এসেছিলাম পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সংবিধান প্রণয়নের জন্য আমি এসেছি। সংবিধান প্রণেতাগণ আমার নিকট একটি ইসলামী সংবিধান প্রস্তুত করার আবেদন করেন। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আমরা ইসলামী সংবিধানের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করি। অথচ সংবিধান সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই জানা ছিল না। আপনারা যা পড়েছেন, আমিও তাই পড়েছি। সংবিধান নিয়ে তো কোনো পড়াশোনা ইতিপূর্বে হয়নি। কিন্তু যখন কাজের জন্য বসে গেলাম -আল্লাহর শোকর, বুযুর্গদের জুতো সোজা করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। পঠন পাঠনের কাজে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। যখন সংবিধান মুতালাআ শুরু করলাম, আলহামদু লিল্লাহ সংবিধান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা চলে এল। আমরা যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলাম তা ছিল বেসরকারী।
তারপর সরকারীভাবে একটি প্রস্তুত করা হয় এবং এর জন্য পৃথক বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে মাসে এক হাজার রুপি করে ভাতা প্রদান করা হত। এতে কতিপয় আলিম সদস্যও ছিলেন।

তো বলছিলাম, আমি তো জীবনে কখনো সংবিধান নিয়ে পড়াশুনা করিনি। ইসলামী সংবিধান নিয়েও নয় এবং জাগতিক সংবিধান নিয়েও নয়, এ বিষয়ে কোনো লেখালেখিও করিনি। কিন্তু যখন মাথার উপর দায়িত্ব এসে পড়েছে এবং আমিও মুতালাআ শুরু করে দিয়েছি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান দেখেছি এবং ইংরেজি সংবিধান উর্দূতে অনুবাদ করিয়ে পড়েছি, তখন এ বিষয়ে আমার এত জানা-শোনা হল যে দাবি করে বলতে পারি, সারা পৃথিবীর সংবিধান আমাদের জানা আছে।

একবার খাজা নাযিমুদ্দীন সাহেব -আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন- ভাল মানুষ ছিলেন, তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী। তার সাথে আরো চার-পাঁচ জন বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন। মজলিশে কথাবার্তা চলছিল। একজন -তিনি এখনও জীবিত, আমি তার নাম নিচ্ছি না- আমার দিকে ইশারা করে বললেন, আপনি সংবিধান সম্পর্কে কী জানেন? সে মনে করেছিল, আমি একজন হুযুর মানুষ। মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি। ওযু-ইস্তিঞ্জার মাসআলা জানা থাকলেও সংবিধান সম্পর্কে আমার জানাশোনা আর কীইবা থাকবে!
তিনি অনেকটা তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, মাওলানা! আপনার তো এ বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই। আমার খুব রাগ হল। আমি বললাম, সংবিধান সম্পর্কে আমি জানি না! আমি খুব ভাল করেই জানি, আপনি সংবিধান নিয়ে পকেটে করে যে নোট নিয়ে এসেছেন, যা

আপনার সেক্রেটারি প্রস্তুত করে দিয়েছে,  আপনার জ্ঞানের দৌড় ঐ পর্যন্তই। আপনার নিজের জানা নেই, সংবিধান কাকে বলে! অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি সারা দুনিয়ার সকল সংবিধান মুতালাআ করেছি। আপনি আমাকে যে কোনো সংবিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, আমি আপনাকে বলে  দেব, ইংল্যান্ডে কী হচ্ছে? হিন্দুস্তানে কী হচ্ছে? এবং কী হচ্ছে ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে?
কী ধরনের সংবিধান অনুসরণ করে তারা দেশ চালাচ্ছে, আমি আপনাকে বলে দেব। অথচ আপনি আমাকে বলছেন, আমার কোনো ধারণা নেই সংবিধান সম্পর্কে!

আমার কথা শুনে তিনি এই যে চুপ করলেন তারপর আর কোনো কথা বলেননি। সেই মজলিশেও না এবং পরবর্তী আর কোনো মজলিশেই না।

তো আমি বলছিলাম, আমি তো রাজনীতি শিখিনি। তেপ্পান্ন বছর বয়সে পাকিস্তানে হিজরত করি। দু'বছর লেগে যায় দেশ গঠন করতে করতে। কেবল তখনই রাজনীতির অঙ্গনে অল্পবিস্তর আসা হয়। এর পূর্বে কি আমার জানা ছিল, রাজনীতি কী জিনিস? কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়ল, তখন আল্লাহ রাস্তা খুলে দিলেন।

## বিশ শতকের ইসলামী সংবিধান

একবার পাকিস্তানের চার প্রদেশের চার প্রধানমন্ত্রী এবং আরো বড় বড় মন্ত্রী এবং আমাদের আলিমদের মধ্যে মতবিনিময় হচ্ছিল। তারা বলছিলেন, আপনারা যে সংবিধানের কথা বলছেন তা এ যুগে অচল। আমরা বললাম, যদি ইসলাম এ যুগে অচল হত, তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে কখনো এ নির্দেশ দিতেন না।
আমাদের বিশ্বাস, এ যুগেও ইসলাম সে যুগের মত অবশ্যই চলবে। এসব বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। কথা তো অনেক দীর্ঘ হল। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা হল, নূরুল আমিন সাহেব, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ঘরে গিয়ে বললেন, সত্য কথা তো তাই যা মুফতি ছাহেব বলেছেন। আমাদের মানা না মানা সেটা আরেক জিনিস। ইনসাফের কথা হল, মুফতি সাহেবের কথাই সঠিক।

তো যাইহোক, আমরা ইলম যেভাবে অন্বেষণ করতে হয় সেভাবে অন্বেষণ করেছি। যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের পড়ালেখা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। পড়ালেখা থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহর শোকর এমনভাবে কাজ করেছি যে বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও আমাদের শিক্ষাদীক্ষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকত। যে কোনো আলিমের কথাই বলুন, দুনিয়াতে যারাই দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যদি তাদের ছাত্রজীবন দেখা হয় তাহলে কোথাও একথা খুজে পাবেন না যে, ছাত্রজীবনে তারা সভা-সমাবেশ করতেন এবং জোরে-শোরে শ্লোগান দিতেন।

যদি তারা ছাত্রজীবনে শ্লোগান দিতেন তাহলে দ্বীনের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেয়া তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না।
বড় বড় আলিমদের মধ্য থেকে যারাই রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন, তারা সকলে এমনই ছিলেন। তাদের ছাত্রজীবন রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তারা শুধুই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপর আল্লাহ যখন তাদেরকে কাজে লাগিয়েছেন তখন রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের দ্বারা অনেক কাজ হয়েছে। এ সব কিছু শোনানোর উদ্দেশ্য হল, ছাত্রজীবনকে গনীমত মনে করে কাজে লাগান। এখনো সময় আছে।

## স্কুল-কলেজের ধ্বংসাত্মক পরিণতি

বিশেষভাবে রাজনীতি আজ স্কুল-কলেজকে শেষ করে দিয়েছে। তাদের কাছে না ইলম আছে, না দ্বীন আছে না দিয়ানতদারী, না হালাল-হারামের পার্থক্য। শুধু আছে শ্লোগান, আর শ্লোগানের পেছনে ডিগ্রি। আর ডিগ্রীর উপর নির্ভর করে তাদের চাকুরি। এভাবে চলেও তারা পার পেয়ে যায়।
কারণ তারা শ্লোগান দিতে শিখেছে এবং শ্লোগান দিয়ে চড়াও হয় নিজেদের প্রধান শিক্ষকের উপর- দাও, আমাদেরকে ডিগ্রি দিয়ে দাও। এভাবে তাদের চাকুরিও হয়ে যায় এবং দুনিয়াতে তারা বাহ্যিকভাবে কামিয়াবও হয়ে যায়। যদিও  সেটা কোনো কামিয়াবি নয়, কেবল ছাই।

## সার্টিফিকেট বনাম জ্ঞান ও যোগ্যতা

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা !
আমি বলতে চাই, আপনারা এসবের লোভ করবেন না। আপনাদের সনদের দু'পয়সারও মূল্য নেই। ধরুন, আমি বড় বড় উপাধি আপনার নামের শুরুতে লিখে দিলাম। বাজারে যান, দেখবেন সেগুলোর মূল্য দু'পয়সাও হবে না। অফিসে যান, কোনো চাকুরিও এই সার্টিফিকেট দিয়ে পাবেন না। হ্যাঁ, যদি আপনার যোগ্যতা থাকে তাহলে সবকিছু আছে। এটা অনেক বড় মূল্যবান জিনিস। আর যদি যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কিছুই নেই। সুতরাং আপনারা সার্টিফিকেটের লোভ করবেন কেন?

দেখুন আমি যা বলছি হয়ত আমার পরে এ কথা বলার কেউ থাকবে না। আমি শুধুশুধুই আমার চুলদাড়ি সাদা করিনি। বরং সারাটা জীবন এ কাজেই ব্যয় করলাম । আমার চোখ খুলেছে মাদরাসায়। ছাত্রদের মাঝে আমার শৈশব কেটেছে। শৈশবের খেলাধূলাও আমি করেছি ছাত্রদের সাথে। আমার জীবনটাই কেটেছে দারুল উলূম দেওবন্দের পরিবেশে। ঐ সকল আকাবিরের কোলে, বর্তমান দুনিয়ায় যাদের কোনো নযীর খুঁজে পাবেন না। সেসকল আকাবিরদের তত্ত্বাবধানে শুধু পড়িনি, পড়িয়েছিও।

## জীবনের একটি অভিজ্ঞতা

প্রিয় ছাত্ররা!
আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিশ্বাস করুন, আমার পরে একথা বলার লোক আর পাওয়া যাবে না। কারণ সেই পরিবেশ দেখেছে এবং এত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এমন লোক আর কেউ বেঁচে নেই। সবাই নবীন। নতুন কাজে যোগ দিয়েছে। অল্প কিছু লাভের পেছনে তারা ছুটে যায়।

আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা হল, যে ছাত্র তার ছাত্রজীবনে অন্য কোনো ধান্দায় লিপ্ত হয়ে যায়, বিশেষভাবে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগদান করে ...। রাজনীতি তো ছাত্রদের জন্য একেবারে বিষের মত। প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে বক্তৃতা-প্রশিক্ষণের যে প্রোগ্রামগুলো হয় এতে বাড়াবাড়ি করাও ক্ষতিকর। অনেকে দেখা যায়, সবক-তাকরার

ইত্যাদি বাদ দিয়ে বক্তৃতা শেখার পেছনে লাগে, এটা কিন্তু তাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। হ্যাঁ, সাদামাটাভাবে প্রতি সপ্তায় বক্তৃতা শেখার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

তো ভাই, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হল- এবং এই অভিজ্ঞতা সেসকল মনীষীরও যারা ছাত্রজীবনকে জ্ঞান অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছেন, বরং অমুসলিম মনীষীদের অভিজ্ঞতাও এটাই। হযরত শাইখুল হিন্দের আন্দোলনের সময়ের কথা। বেনারস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর -যিনি হিন্দু ছিলেন- তার ভার্সিটিতে এক বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, আমি ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ কিছুতেই দেব না। কারণ, রাজনীতি ছাত্রদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

তাই বলি, এই সময়কে গনীমত মনে করুন। যা বলেছি সেগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। কুরআনের আয়াত কী বলে সেটা দেখুন। আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আপনাদের তো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। এই সময়টিকে শুধুই কিতাব বোঝার, দ্বীনী প্রজ্ঞা অর্জন করার এবং বৃদ্ধি করার পেছনে ব্যয় করুন। দু'চার বছর এভাবে মেহনত করেই দেখুন না।

چند روزی جهد کن باقي بخند

'অল্প কিছু দিন পরিশ্রম কর, তারপর বাকি জীবন সুখে থাক।'

## বর্তমান রাজনীতি

যখন ছাত্রজীবন সমাপ্ত হবে তখন যদি কারো মনে চায় রাজনীতি করতে তাহলে ইস্তেখারা করবে। চিন্তাভাবনা করবে। যদি রাজনীতি সত্যিই দ্বীনের স্বার্থে হয়ে থাকে...। আজকাল রাজনীতি এত নোংরা হয়ে গেছে যে, যারা ধর্মের জন্য রাজনীতি করে, রাজনীতিতে গিয়ে তাদের ধর্মও শূন্যের কোঠায় নেমে আসে এবং অনিচ্ছাতেই অন্যান্য জিনিস লেগে যায়। আমি তো রাজনীতির পেছনে দশ বছর ব্যয় করেছি। শেষে এই দেখে বের হয়ে এসেছি যে, মানুষ সেখানে যাওয়ার পর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

এরপর অন্যান্য লাভালাভের চিন্তা প্রবল হয়ে পড়ে। ফলে সে বাধ্য হয় দ্বীনের খেলাফ চলতে। তখন শুধু বিভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় খোঁজে। যাইহোক পড়ালেখা সমাপ্ত হওয়ার পর

প্রত্যেকে স্বাধীন। যদি পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের পর সত্যি সত্যি ইসলামী সিয়াসত মনে হয় তাহলে বাধা নেই। দ্বীন রক্ষার জন্য তা ভালো কাজ। যেমন আমিও দু'বছর পাকিস্তান হওয়ার আগে এবং দশ বছর পাকিস্তান হওয়ার পর রাজনীতিতে ব্যয় করেছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের কর্ণধারদের সাথে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে চেষ্টা করেছি রাজনীতিকে ইসলামের রঙ্গে রঙ্গীন করার। কিন্তু ফলাফল শূন্য।

## দ্বীনী মাদরাসার গুরুত্ব

পরে মনে হল, যাক নিজের কাজ করি। নয়তো এটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। কারণ, 'ইলম অন্বেষণ করলে সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়।' এ উদ্দেশ্যে মাদরাসা বানালাম এবং মাদরাসাকে মনে হল গনীমত । দ্বীনের যেটুকু নিঃশ্বাস বাকি আছে তা এই মাদরাসার উসিলায় এবং এটা তখনই হবে যখন সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে একমনে পড়ালেখায় লেগে থাকবেন এবং এ সময়টাকে গনীমত মনে করে কাজে লাগাবেন।

دل آرامے کہ داری دل درد بند
دگر چشم از ہمہ عالم فروبند

'সবকিছু থেকে চক্ষু বন্ধ করে ইলমের পেছনে লাগ। চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাও।'

যে কোনো বড় আলিমের কথাই বলেন তার ছাত্রজীবন দেখুন। দেখবেন ছাত্রজীবনকে তিনি সত্যিকারের ছাত্রের মতই ইলমের অন্বেষণে কাটিয়েছেন। যদি আপনারা দুনিয়া আখেরাতে সফলতা চান তাহলে এই বৃদ্ধের কথা শুনুন এবং মানুন । এরপরে এভাবে উপদেশ দেয়ার লোক আর পাবেন না। কারণ আমি যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, মাদরাসার মধ্যে পড়ে এবং পড়িয়েই আমার জীবন কেটেছে। আল্লাহ জানেন, চোখের সামনে কত মাদরাসা গড়তে দেখেছি এবং ভাঙ্গতে দেখেছি। সুতরাং আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিশেষভাবে এ কাজে লেগে থাকুন ।

## সফলতার রহস্য

দ্বিতীয় বিষয় হল, হালাল-হারামের চিন্তা করুন। তাকওয়া অবলম্বন করুন। শুধু এইটুকু আমল করুন। অতিরিক্ত নফল নামায, নফল যিকির আযকার ইত্যাদির কথা বলছি না।

শুধু বলছি, নামায রোযা গুরুত্বসহ আদায় করুন। সবকিছুতে হালাল-হারাম বেছে চলুন। যদি আপনারা সবকিছুতে হালাল-হারাম বেছে চলতে পারেন তাহলে সবকিছু আপনাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। যেখানেই যাবেন ইনশাআল্লাহ সেখানেই আপনাদের কদর হবে। আল্লাহর সাহায্য সর্বদা আপনাদের সাথে থাকবে।
আর যদি এই সময়টাকে নষ্ট করে ফেলেন-আল্লাহ না করুন- তাহলে দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে। ইলম তো আসবেই না, বরং যে জিনিসের জন্য এ সময়কে নষ্ট করা হয়েছে তাও অর্জিত হবে না। তখন  কেবল ক্ষতিই ক্ষতি হবে। আপনাদের মূল্য নির্ণীত হবে ইলমের মাধ্যমে, যোগ্যতার মাধমে। অথচ এই ইলম ও যোগ্যতা তো অর্জন করেননি।

যারা কলেজে পড়ছে তাদের সেখানে ইলম নেই। আগে কিছু যোগ্য লোক সেখানেও তৈরী হত, এখন তাও হচ্ছে না। তবে ডাণ্ডার জোরে ডিগ্রি ঠিকই আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু আপনাদের তো এ উপায় নেই। সুতরাং নিজেদের অবস্থার উপর দয়া করুন। বছর শেষ হওয়ার আরো এক দেড় মাস বাকি। অভিজ্ঞতায় এটাও দেখা যায়, কেউ যদি শুরুর সময়ে গাফেল থাকে কিন্তু শেষ সময়ে মেহনতের সাথে পড়ে তাহলে সেও সফলতা লাভ করে।

## সময়ের মূল্য দিন এবং কাজ করে যান

ভাই আগে যদি না করে থাকেন তাহলে এখন করুন। নিজের উপর একটু দয়া করুন। নিজের মা-বাবার উপর একটু দয়া করুন। তারা আপনাদেরকে এই কাজের জন্য এখানে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনারাও কিছু অর্জন করে নিন। অর্জন  করার সময় এখনই। যদি এই সময় অতীত হয়ে যায় তাহলে এই সম্পদ আর কোনোভাবে অর্জন করতে  পারবেন না। দুনিয়ার সকল কিছু আসবে। যা চাও হয়ত তাই পাবে। কিন্তু ইলম আর পাবে না। যে সকল জিনিস উস্তাযের নিকট থেকে শিখতে হয়, তাতে ইলম, আমল, আখলাক ও আদাব সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। আমি একদু'জন নয় অনেক তালিবুল ইলমকে দেখেছি, যারা সময় অপচয় করেছে। তারপর পরিণামে নিজেরা ধ্বংস হয়েছে।

আমরা যারা শিক্ষকতা করছি, আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরে কৃতকার্য হয় যদি তাদেরকে আমরা নিজেদের মানদণ্ড যাচাই করি তাহলে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই

যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে। আগের মানদ- অনুসারে পরীক্ষা নিলে আপনাদের মধ্যে হয়ত চার পাচঁজন খুব কষ্ট করে পাস করতে পারবে। আমরা এখন দেখেও না দেখার ভান করে আপনাদের পাস করিয়ে দিই। যোগ্যতা তো কমছেই কমছে। এরপর যদি মুতালাআও কমিয়ে দেন তাহলে কী অবস্থা হবে? যাক, এ কথার উপরই আজকের মজলিশ শেষ করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবকিছুকে তাফাক্কুহ অর্জনের জন্য বিসর্জন না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাফাক্কুহ হাসিল হবে না।
মাদরাসায় তো আপনারা এজন্যই এসেছেন। এজন্যই তো আপনাদের বাবা মা আপনাদেরকে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন।আপনারা খাওয়া-দাওয়াও এ উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। মানুষের সামনে এটাই বলেন যে, আমরা দ্বীনি ইলম হাসিলের জন্য মাদারাসয় এসেছি।

সুতরাং আপনাদের দায়িত্ব হল তাফাক্কুহ অর্জনের চেষ্টা করা। এখনও যদি চেষ্টা করেন তাহলে সারা বছরের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। সেসাথে নামাযের পাবন্দী করুন।
একটু চিন্তা করুন, যদি আমাদের নামাযটাই এখনো ঠিক না হয় তাহলে আমরা দ্বীনের কী খেদমত করব? কমপক্ষে নামাযটা তো আমাদেরকে জামাতের সাথে গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত।
এর জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করবেন। সহানুভূতির সাথে, রাগের সুরে নয়। ফযরের সময় একে অপরকে আস্তে আস্তে উঠিয়ে দিবেন। যদি সে না উঠে আর আপনি নামায পড়তে চলে যান, তাহলে নামাযের পর আবার তাকে জাগিয়ে দিন।
নিজের ভাইয়ের পেছনে এইটুকু মেহনত তো আমাদের করতে হবে।
ভাষান্তর : এনামুল হাসান

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/1217/&https://www.alkawsar.com/bn/article/1230/ ]

## অভিনব ইলম চর্চা

বিখ্যাত হানাফী ফকিহ শামসুল আয়িম্মা সারখাসী রহ.-কে আওযাজান্দের শাসক কূপের মতো একটি জেলে বন্দি করে রেখেছিলেন। তার শিষ্যরা কূপের কিনারে জমা হতো আর তিনি কূপের ভেতর থেকেই হাকিম শহীদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল কাফী* (যাহিরুর রিওয়ায়ার সারাংশ)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাতেন। তখন তার কাছে কোনো কিতাব ছিল না, নিছক স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে লেখাতেন। এভাবে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এটি ৩০খন্ডে প্রকাশিত হয়। এর নাম *'আল মাবসুত'*। এটি হানাফী ফিকহের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

তেমনি বন্দি অবস্থাতেই তিনি উসুলুল ফিকহের একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করান, যা দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদের *আস সিয়ারুল কাবীরের* ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করান, যা দুই খন্ডে। এটি অবশ্য মুক্তি পাওয়ার পর সমাপ্ত করেন। –শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয় :৫১

❒ ইমাম আবু হানিফা রহ-র ইলমি মর্যাদা লাভের কারণ

ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি কীভাবে এই ইলমি ও ফিকহি মর্যাদা লাভ করেছেন?'

তিনি উত্তর দেন:

ما بَخَلْتُ بِالإفادَةِ وَ لَمْ اَسْتَنْكِفْ عَنِ الاسْتِفادَةِ

'আমি অন্যকে উপকার পৌঁছাতে কার্পণ্য করিনি আর কারো কাছ থেকে উপকৃত হতে লজ্জাবোধ করিনি'

কী হিকমতপূর্ণ জবাব! কেউ এই অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে নিঃসন্দেহে সফল হবে। –প্রাগুক্ত :১১২

★ অমূল্য বাণী

প্রখ্যাত আলিম ইমাম ইবনে আতাউল্লাহ ইসকান্দারীর প্রসিদ্ধ একটি উক্তি রয়েছে, যা সকল আলিম ও তালিবুল ইলমের সর্বদা মনে রাখা উচিৎ :

مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بِدايَةٌ مُحْرِقَةٌ, لَمْ تَكُنْ لَهُ نِهايَةٌ مُشْرِقَةٌ

'যার শিক্ষাজীবনের সূচনাকাল মেহনত- পরিশ্রমে না কাটবে, তার পরবর্তী জীবন উজ্জ্বল হবে না'

–প্রাগুক্ত :৪৯

★ইমাম আসমায়ীর বাণী

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত ইমাম আসমায়ীর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি:

كُلُّ عِلْمٍ لا يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهِ الحَمَّامَ فَلا تَعُدُّهُ عِلْمًا

'যে ইলম গোসলখানায় মানুষের সাথে থাকে না, অর্থাৎ তার মগজে সংরক্ষিত থাকে না, তুমি সেটাকে উপকারী ইলম মনে করো না'

–প্রাগুক্ত :১৭৫

## লিপিবদ্ধ ইলমের উপকারিতা

একটি প্রবাদ বিখ্যাত আছে:

مَا كُتِبَ قَرَّ وَ مَا حُفِظَ فَرَّ

'লিখিত বিষয় স্থায়ী হয় আর মুখস্থকৃত বিষয় উড়ে যায়'

মুখস্থ করার গুরুত্ব কমানো এটার উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো, অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে বা অন্য কোনো কারণে স্মৃতিশক্তি কমে যায়। এজন্য ইলমকে লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করাও জরুরী।  যাতে ভুলে গেলে তা দেখে স্মরণ করা যায়।

মোটকথা, ইলম মুখস্থ রাখা একজন আলিমের পুঁজি। তবে ভবিষ্যতের জন্য ইলম সংরক্ষণ করতে লিপিবদ্ধ করাও জরুরী। এটি অস্বীকার করা যাবে না।

–প্রাগুক্ত **:১৭৯**

## ইলম প্রচার-প্রসারের গুরুত্ব

ইলম শেখার এক ফযীলত আর শেখানোর ভিন্ন ফযীলত। সব কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে, ইলমের উদ্দেশ্য হলো আমল করা। আবার অন্যের নিকট পৌঁছানোও ইলম অর্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

اِنَّما بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

‘আমাকে মু'আল্লিম হিসেবে পাঠানো হয়েছে’

**এক.** হযরত ওমর রা. বলেন: ‘ ইলম শেখো এবং শেখাও। এমনিভাবে মানুষকে ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য শেখাও। আর যাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছ তাদের প্রতি বিনয়ী হও, উদ্ধত হয়ো না।’

**দুই.** হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন:

تَعَلَّمُوا العِلْمَ فَاِنَّ اَحَدًا لَا يُولَدُ عالِمًا

‘ইলম শেখো; কারণ কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না’
-ইহইয়াউল উলুম ২৯

**তিন.** হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ العِلمَ ثمَّ لا يُحَدِّثُ به كَمَثَلِ الَّذِي يكنِزُ الكَنزَ فلا يُنفِقُ منه

'যে নিজে ইলম শিখে কিন্তু অন্যকে শেখায় না সে ওই ব্যক্তির মত যে সম্পদ জমা করে কিন্তু তা থেকে খরচ করে না’
-মু'জামে তাবরানী **১/২১৩**

**চার.** হযরত মুয়ায জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَلَّمَ عِلمًا فَلَهُ أجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لا يَنْقُصُ مِنْ أجْرِ العامِلِ

'যে ব্যক্তি কাউকে ইলম শেখায় আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব সেও পাবে, তবে আমলকারীকে তার সাওয়াব কোনো অংশে কম দেয়া হবে না’
- ইবনে মাজাহ ২৪০

**পাঁচ.** হযরত ফুযাইল ইবনে গাযওয়ান রহ. বলেন,

لا تَمْنَعِ العِلمَ مِنْ اَهْلِهِ فَتَأْثَمَ ولا تُنْشِره عِندَ غَيرِ اَهْلِه فَتَجْهَلَ وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوائَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ اَنَّهُ يَنْفَعُ

'যোগ্য লোককে ইলম না শেখানো গোনাহ। আবার অযোগ্যকে ইলম শেখানো মূর্খতা। তোমাদের হতে হবে বিচক্ষণ ডাক্তার। ডাক্তার যেখানে সুস্থতার সম্ভাবনা দেখে ঔষধ লাগায়’
- জামেয়ু বায়ানিল ইলমি

সুতরাং তোমাদেরও জানতে হবে কাকে কী পরিমাণ শেখাতে হবে।

**ছয়.** হযরত লোকমান হাকিম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে বৎস, এ উদ্দেশ্যে ইলম শিখবে না যে, আলেমদের সাথে বিতর্ক করবে, মূর্খদের সাথে গর্ব করবে। অথবা সভা-সমাবেশে ইলম জাহের করে বেড়াবে। ইলম-চর্চায় অবহেলা করবে না, মূর্খদের সাথে মিশবে না, বরং আলেমদের সাথে থাকবে। কোনো দলকে আল্লাহর জিকির করতে দেখলে তাদের সাথে বসবে। কারণ তুমি আলেম হলে এতে তোমার উপকার হবে। আর মূর্খ হলে কিছু শেখা হবে। তাদের ওপর রহমত নাযিল হলে তুমিও পাবে রহমতের কিছু অংশ। যারা আল্লাহর জিকির করে না তাদের সাথে বসবে না। কারণ তুমি আলেম হলে মূর্খদের সংশ্রবে তোমার ইলম ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর মূর্খ হলে তোমার মূর্খতা বাড়বে। আবার তাদের ওপর কোনো শাস্তি হলে তা তোমার ওপরও নেমে আসবে' - জামেয়ু বায়ানিল ইলমি

**সাত.** হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন:

لا يَتَعَلَّمُ العِلمَ مُسْتَحْيِ وَلا مُسْتَكْبِرٌ

'অতি লাজুক ও অহংকারী ইলম শিখতে পারে না'
- আল মাজমু'

**আট.** হযরত মুয়ায রা. বলেন,

تَعَلَّمُوا العِلمَ فإنَّ تَعَلُّمَه حَسَنَةٌ وطَلَبَه عِبادَةٌ و مُذاكِرتَه تَسْبِيحٌ والْبَحْثَ عَنْه جِهادٌ وَ بَذْلَه قُرْبَةٌ وَ تَعْلِيْمَه مَنْ لا يَعْلَمُه صَدَقَةٌ

'তোমরা ইলম শেখো। কেননা ইলম শেখা নেক কাজ, তা অন্বেষণ করা ইবাদত। ইলমের মুযাকারা তাসবীহতুল্য। ইলমী আলোচনা জিহাদতুল্য। ইলম শেখানো সদকাতুল্য। আর যার ইলম নেই তাকে শেখানো সদকাতুল্য'
- তাযকিরাতুস সামে' **২১**

তিনি অন্যত্র বলেন,

العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ والحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ

'ইলম আসে চর্চা-অনুশীলনে আর হেলেম আসে ধৈর্য ও সহনশীলতায়’

প্রকৃত ইলমের সাথে সাথে মানুষের হেলেমও বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরো বলেন:

لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما آتاهُمْ العِلمُ مِنْ اَصْحابِ رَسُولِ اللهِ و مِنْ اَكابِرِهِمْ فإذا جاءَ العلمُ مِنْ قِبَلِ اَصاغِرِهِمْ فذلِكَ حِيْنَ هَلَكُوا

'যতদিন পর্যন্ত মানুষ সাহাবী ও তাদের পরবর্তীদের থেকে ইলম শিখেছে তাদের অবস্থা ভালো ছিল। পরে যখন ছোটদের থেকে ইলম শিখতে শুরু করল তখনই ফাসাদ দেখা দিল’

অনেকে বলেন:

البَرَكَةُ مَعَ اَكابِرِكُمْ
'বড়দের সাথে থাকে বরকত’

আজকাল লোকে ইন্টারনেট ঘেঁটে ইলম শেখে। পরে সে অনুযায়ী আমল শুরু করে দেয়। কারো কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন বোধ করে না। এতে প্রায়ই ফেতনা-ফাসাদ ছড়ায়।

## ইলম অন্বেষণের জন্য জরুরী কিছু বিষয়

ক. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, তালিবুল ইলমের মধ্যে এই তিনটি গুণ না থাকলে ইলমের পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে না:

১. ইলমের প্রতি আগ্রহ
২. জন্মগত মেধা ও বুঝশক্তি
৩. প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থা

খ. ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, তালিবুল ইলমের মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকা জরুরী :

১. দীর্ঘ জীবন তথা দীর্ঘদিন ইলম অন্বেষণ
২. আর্থিক সচ্ছলতা। তালিবুল ইলমকে শিক্ষাকালীন অবস্থায় জীবিকা উপার্জন থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে।
৩. বুঝশক্তি ও মেধা। যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মেধা প্রদান করা হয়, সে তার গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছতে পারে।

এই তিনটি বিষয় ইমাম শাফিয়ীর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যেতো। এ কারণে তিনি মাত্র ৫৪ বছর জীবন পেলেও আল্লাহ তাআলা তার ইলমে অতুলনীয় বরকত দিয়েছেন।

গ. আল্লামা মাওয়ারদী বলেন, নিম্নের গুণাবলি থাকলে তালিবুল ইলম আল্লাহর তাওফিকে ইলমে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে :

১. বোধশক্তি
২. বুঝশক্তি
৩. প্রতিভা
৪. ইলম অর্জনের আগ্রহ
৫. প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ
৬. অন্যান্য কাজ থেকে অমুখাপেক্ষীতা

৭. দুঃখ- বেদনাহীন একাগ্রতা
৮. দীর্ঘজীবন
৯. স্নেহশীল ও দয়ালু উস্তাদ

ঘ. হাফিয ইবনুন নাজ্জার ইমামুল হারামাইনের উদ্ধৃতিতে এই কবিতা উল্লেখ করেছেন:

أَخِيْ لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ ☆ سَأُنْبِئُكَ عَنْ تَفْصِيْلِها بِبَيانِ

ذَكاءٌ وَ حِرْصٌ وَ افْتِقارٌ وَ غُرْبَةٌ ☆ وَتَلْقِيْنُ أُسْتاذٍ وَطُوْلُ زَمانِ

'ভাই, ৬টি বিষয় ব্যতীত তুমি ইলম পাবে না। সেগুলো হলো– মেধা, আগ্রহ, দারিদ্র্য, প্রবাস, উস্তাদের দীক্ষা ও দীর্ঘ সময়'

★ ইমাম মালিক রহ. এর বিখ্যাত উক্তি:

إِنَّ هٰذا الأَمْرَ لَنْ يُنالَ حَتّٰى يُذاقَ فِيْهِ طُعْمُ الفَقْرِ

' দরিদ্রতার স্বাদ আস্বাদন ব্যতীত ইলমের উঁচু স্তর অর্জিত হয় না'

ঙ. আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার শর্ত ও দায়িত্ব তো অনেক, কিন্তু মৌলিকভাবে নিচের ৭টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী :

১. ইখলাস
২. ইলমের জন্য বিনয়
৩.উস্তাদের সামনে বিনয়
৪. উস্তাদের পরামর্শ বাস্তবায়ন
৫. ধারাবাহিকভাবে ইলম অর্জন

৬. ইলমি আলোচনা
৭. ইলমের ওপর আমল

❒ আল্লামা সাখাবী রহ. বলেন, কিছু বিষয় ইলম অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক:

১. দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ইবারত পড়া
২. সুন্দর হস্তাক্ষরে দ্রুত লিখতে পারা
৩. ভালো ছাত্রদের সঙ্গ
৪. নেতা ও ধনীদের কাছে যাতায়াত না করা
৫. সময় কাজে লাগানো

— শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয় : ৪৪

# ইলম অনুযায়ী আমল

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো, সে অনুযায়ী আমল করা। যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এবিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন:

ياأَيُّها الناسُ تَعَلَّمُوا فَمَنْ عَلِمَ فَلْيَعْمَلْ

'হে লোকসকল! তোমরা ইলম অর্জন করো। আর যা কিছু অর্জন করেছো তার ওপর আমল করো’

তিনি আরো বলেন, নিজে আমল শুরু না করে অন্যকে নসিহত করবে না। ইলম শেখো তাহলে ইলমই বলে দেবে – তোমার কী করণীয়। শয়তান মানুষকে কীভাবে ধোঁকা দেয়, আর সে ধোঁকা থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়, সবই বলে দেবে ইলম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলও ছিল এমন। তিনি বলেন,

أُوصِيْ نَفْسِيْ اَوَّلًا وإِيَّاكَ بَعْدَه

'আমি প্রথমে নিজেকে অসিয়ত করি পরে অন্যদের’

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. বলেন, ইলম অর্জনের পরও যার মাঝে খোদাভীতি ও রোনাজারি না আসে সে ইলমের উপযুক্ত নয়। পরে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন-

أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُون َ

‘তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ?তোমরা হাসো কেন? কাঁদো না কেন?’ -সূরা নাজম ৫৯-৬০

ইলমের সাথে যদি তাকওয়া-তাহারাত না আসে বুঝতে হবে তার ইলম কাজে আসেনি।

হযরত হাসান বসরী রহ. নিজ যামানার লোকদের সম্পর্কে বলেন:

قَدْ كانَ الرجُلُ يَطْلُبُ العِلمَ فَلا يَلْبَثُ اَنْ يُري ذلكَ في تَخَشُّعِهِ وَ هَدْيِهِ وَلِسانِه و بَصَرِه وَيَدَيْهِ

'প্রকৃত ইলম অর্জনের সাথে সাথেই এর প্রভাব পড়ে মানুষের তাকওয়া-তাহারতে, আচরণে-উচ্চারণে, চাহনিতে ও অঙ্গসঞ্চালনে' -আল জামেয়ু লি আখলাকির রাবী ৫১

আমাদের আকাবিরগণ ইলম অর্জনের সাথে সাথে তা আমলে পরিণত করতেন। তিনি আরো বলেন,

اَفْضَلُ العِلْمِ الوَرَعُ وَالتَّفَكُّرُ

'সর্বোত্তম ইলম হলো, যাতে তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং চিন্তা-ফিকির থাকে'

ফকীহদের ব্যাপারে তিনি বলেন:

الفَقِيْهُ العالِمُ فِي دِيْنِه الزَّاهِدُ فِيْ دُنْياه الدَّائِمُ عَلى عِبادَةِ رَبِّه

'ফকীহ বলা হয় দ্বীনের ব্যাপারে যিনি হন আলেম এবং দুনিয়ার ব্যাপারে হন যাহেদ, আর সর্বদা ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন'

হযরত হাসান বসরী রহ. আরো বলেন,

'ইলম অর্জন করতে গিয়ে যেন ইবাদতে ত্রুটি না হয়। আবার ইবাদতও এতটুকু করবে যেন তলবে ইলমে প্রভাব না পড়ে।

তিনি আরো বলেন,

‘তোমার ইলমের প্রভাব যেন পড়ে তোমার ওপর। তোমার স্বভাবে যেন থাকে ধীরতা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্য। আলেমগণ কখনো অযথা কথা বলেন না। আর সাধারণ মানুষের অবস্থা হলো, এক মুহূর্তে তারা এক মাসের কথা বলে ফেলে। -ইলমে নাফে

হযরত জুননুন মিসরী রহ. বলেন:

‘আগেরদিনে ইলমের কারণে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমতো আর আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ বাড়তো। এখন দেখা যায় ইলম হলে দুনিয়ার আকর্ষণ বাড়ে। মানুষ আগে ইলমের পিছনে সম্পদ ব্যয় করতো, এখন ইলম দিয়ে সম্পদ উপার্জন করতে চায়। আজ অনেক আলেমকে দেখা যায় জাহেরী-বাতেনী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত’ - ইলমে নাফে

হযরত আমর ইবনে হারেস বলেন,

اِنَّ رجُلًا كَتَبَ اِلى اَخٍ لَه : اِعْلَمْ اَنَّ الحِلْمَ لِباسُ العلمِ فلا تَعْرِيَنَّ مِنهُ

'এক লোক তার ভাইকে লেখেন– দেখো, হেলেম হলো ইলমের লেবাস ; সুতরাং ইলমকে কখনো লেবাসমুক্ত করো না’

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বলেন,

ما اُوتِيَ شَيْءٌ اَزْيَنَ مِنْ حِلْمٍ اِلى عِلْمٍ

'ইলমের সাথে সাথে হেলেম পাওয়ার চেয়ে মূল্যবান কিছু হতে পারে না’- জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ১৭০

হযরত মাসরুক বলেন:

بِحَسَبِ الرجُلِ مِن العلمِ اَنْ يَخْشَي اللهَ عَزَّ وجلَّ وبِحَسبِ الرجُلِ مِن الجَهْلِ اَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِه

' কারো জন্য এতটুকু ইলম যথেষ্ট যাতে সে খোদাভীরু হতে পারে। আর জাহেল হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট নিজের ইলম নিয়ে সে গর্ব করবে’

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন:

اِنِّ لاَحْسِبُ الرجُلَ يَنْسَي العلمَ كانَ يَعْلَمُه بِالخَطِيئَةِ يَعْلَمُها

'যারা ইলম শিখে ভুলে যায় আমার মতে তারা গোনাহের কারণে ভুলে যায়’

## ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

‘কিয়ামতের দিন বান্দার পদযুগল সরবে না, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তার জীবনকাল কিরূপে অতিবাহিত করেছে, তার জ্ঞান কী কাজে লাগিয়েছে, তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে এবং তার শরীর কিভাবে পুরানো করেছে?’

(তিরমিযী, হা/২৪১৭, সনদ হাসান সহীহ)।

অন্যত্র বলেন:

“কুরআনের ইলম অনুযায়ী যে আমল করবে না তাকে জাহান্নামে পাথর দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেয়া হবে”
(বুখারী হা/৭০৪৭)।

এ প্রসঙ্গে ফুযাইল ইবনু ই‘য়ায (রহ.) বলেন,

عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُوْا فَإِذَا عَلِمُوْا فَعَلَيْهِمُ الْعَمَلُ

‘মানুষের জন্য শিক্ষার্জন করা আবশ্যক। আর যখন শিক্ষার্জন করবে তখন তা আমল করা আবশ্যক’ (ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩৭)।

আব্বাসীয় খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুতায বলেন,

عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرَةٍ

‘আমল ছাড়া ইলম ফলহীন বৃক্ষের মত’ (ঐ, পৃ. ৩৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

عِلْمُ الْمُنَافِقِ فِيْ قَوْلِهِ وَعِلْمُ الْمُؤْمِنِ فِيْ عَمَلِهِ

‘মুনাফিকের জ্ঞান হল তার কথার মধ্যে আর মুমিনের জ্ঞান হল, তার কর্মের মধ্যে’ (ঐ, পৃ. ৩৮)।

আবূ আব্দিল্লাহ রুযবারী বলেন,

الْعِلْمُ مَوْقُوْفٌ عَلَى الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ مَوْقُوْفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَالْإِخْلَاصُ لِلهِ يُوَرِّثُ الْفَهْمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَل ّّ

‘ইলম নির্ভর করে আমলের উপর। আর আমল নির্ভরশীল ইখলাসের উপর। আর ইখলাস আল্লাহর তরফ থেকে বুঝার ক্ষমতা এনে দেয়’ (তারীখু দিমাস্ক, ৫/১৮ পৃ.)।

আবু বারযা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

(صحيح لغيره) وروي عن أبي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، مَثَلُ الْفَتِيْلَةِ، تُضِيءُ عَلَى النَّاسِ وَتَحْرِقُ نَفْسَهاَ. رواه البزار

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দান করে অথচ নিজের (আমলের) কথা ভুলে যায়; তার উদাহরণ হচ্ছে চেরাগের মত। চেরাগ মানুষকে আলো প্রদান করে ঠিকই কিন্তু নিজেকে জ্বলিয়ে দেয়। (অর্থাৎ মানুষ উপকৃত হয় ঠিকই, কিন্তু আমল না করার কারণে সে নিজের ক্ষতি সাধন করে)” সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব ;হাদিস নম্বর -১৩০

(এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বাযযার)

আমল ছাড়া ইলমকে বলা হয় মা'লুমাত। পবিত্র কুরআনে বনি ইসরাঈলের এক বে-আমল আলেমকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যত্র তুলনা করা হয়েছে গাধার সাথে। বালআম ইবনে বাউরা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ

'তার তুলনা যেন একটা কুকুর’

হযরত শাকীক বলখী রহ. বলেন: তিনটি বিষয়ে আমল ব্যতীত কোনো ফায়দা নেই, চাই বাক্সভর্তি কিতাব পড়ো না কেন।

১.দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রাখবে না; কেননা এটা মুসলমানের ঘর নয়।
২.শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করবে না; কারণ সে মুসলমানের বন্ধু নয়।
৩.কাউকে কষ্ট দেবে না; কেননা এটা মুসলমানের কর্ম নয়।

হযরত মাইমুন ইবনে মেহরান বলেন, ইলম শেখা ও শেখানো তখনই সার্থক হবে যখন এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াওয়া সাল্লাম -এর আনুগত্য ও খোদাভীতি বাড়বে।

## কুরআন-সুন্নাহর ইলম কেন কল্যাণময়

কুরআন মাজীদের একটি বিখ্যাত আয়াত-

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ  وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا  وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ .

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যে হিকমাহ প্রাপ্ত হয়েছে সে তো প্রভুত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে। -সূরা বাকারা (২) : ২৬৯

কুরআনে কারীমের প্রতিটি ইলম, প্রতিটি বিষয় কল্যাণ। কুরআনে কারীমের যে কোনো বিষয়ের উপর আমলের তাওফীকও  কল্যাণ। কুরআনে কারীমের এক একটি অংশ যে অর্জন করে সে কল্যাণের এক একটি অংশ অর্জন করে। কুরআনে কারীমের এক একটি বিধানের উপর আমলের সৌভাগ্য যে অর্জন করে, সে খাইর ও কল্যাণের এক একটি বড় অংশ অর্জন করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিখ্যাত হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা দান করেন।

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

তাহলে দ্বীনের ইলম, দ্বীনের প্রজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অনেক বড় নিআমত। যাকে তিনি কল্যাণ দান করতে চান তাকে এই নিআমত দান করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।
দুনিয়াতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, আখিরাতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না।

ما شاءَ الله كانَ، وما لم يشَأْ لم يكُن.
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না।
তো হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কল্যাণ-ইচ্ছার একটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন যে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা, দান করেন। সে দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে, দ্বীনের বিধান অনুযায়ী চলতে পারে। আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন করে।

কুরআন ও সুন্নাহতে হিকমাহকে খাইর বলে অভিহিত করা হয়েছে; বরং খাইরে কাছীর প্রভূত কল্যাণ বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল বান্দা যেন, এ ‘খাইরে কাছীর’ অর্জনে উৎসাহিত হয়। খাইর বলে জানবে কিন্তু তা অর্জনে সচেষ্ট হবে না- তা তো হতে পারে না। যার বিচার-বুদ্ধি আছে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি বিশ্বাস আছে, যে নিজের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চায়, সে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে জানবে যে, এই বিষয়টি খাইর, এটি কল্যাণ, তখন অবশ্যই তা অর্জনে সচেষ্ট হবে।
তো কুরআন ও সুন্নাহয় এই কল্যাণ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষ যেন নিজেও এই কল্যাণ অর্জন করে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এই কল্যাণের চিন্তা-ভাবনা করে।

এখানে একথাটিও বুঝতে হবে যে, কুরআন-সুন্নাহর ইলম হচ্ছে এমন কল্যাণ, যা অর্জন করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। এটা নিছক মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক পর্যায়ের বিষয় নয়। ইচ্ছে হয় অর্জন করলাম, ইচ্ছে হল না অর্জন করলাম না- এমন বিষয় নয়; বরং এটা এমন খাইর, যার বিপরীত ‘শার’। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে অকল্যাণ। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে ধ্বংস। এমন কল্যাণ, যা মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ। সুতরাং এটা ঐচ্ছিক কল্যাণ নয়; বরং এমন কল্যাণ, যা অর্জন করতেই হবে।

নিজেও অর্জন করতে হবে, নিজের পরিবার-পরিজন,সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব,পাড়া-প্রতিবেশী সকল মুসলিমের জন্য এই কল্যাণের শুভ কামনা অন্তরে পোষণ করতে হবে।

কুরআনে কারীমের 'সূরাতুত তাহরীমে' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা অতি হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে ইরশাদ করেছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে। কীসের থেকে রক্ষা করবে? 'نَارًا'-ঐ আগুন থেকে, ঐ জাহান্নাম থেকে وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد -সেই জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ। لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُم-যারা আল্লাহ তাআলার কৃত আদেশের অন্যথা করেন না। وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون-এবং তাদের যে আদেশ করা হবে তা-ই তারা করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখিরাতের সেই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। কাকে রক্ষা করার? اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُم-নিজেকে রক্ষা করার এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার।

রক্ষা করার উপায় কী? প্রকৃতপক্ষে রক্ষা তো করবেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া রক্ষাকারী কেউ নেই। এখানে যে আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর- একথার মানে কী? মানে হল তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার উপায় অবলম্বন কর। নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন কর, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন কর। সেই উপায় কী?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

اعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللهِ، وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ، ومُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، يُنْجِيكُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারি করো, নাফরমানী থেকে বেঁচে থেকো আর পরিবার-পরিজনকেও স্মরণ রাখার আদেশ করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন। তাফসীরে ইবনে কাছীর সহীহ বুখারীর এক

দীর্ঘ ঘটনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কিছু যুবক সাহাবীকে যারা বেশ কিছু দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে ইলম অর্জন করেছেন, তাদের উপদেশ দিয়েছেন যে,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ.

পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং ওদের মধ্যে অবস্থান করো আর-

عَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُم.

তাদেরকে শেখাও এবং আদেশ কর। দুটো বাক্য, দুটো কথা। কিন্তু অনেক কথা এই দুই কথার মধ্যে আছে। عَلِّمُوْهُم-তাদেরকে শেখাও।

কী শেখাবে? তাদেরকে ইসলাম শেখাও, দ্বীন শেখাও। আকীদা শেখাও, আমল শেখাও। তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন কর। হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন কর। এটা হল শেখানোর পর্যায়।

এর পরের পর্যায় হল আদেশ কর। শুধু শেখানো নয়, শুধু শেখানোর দ্বারাই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং 'مُرُوْهُم' যা শেখানো হল সেই অনুযায়ী আমলের আদেশ কর। তাদেরকে পরিচালিত কর। তো কুরআন ও সুন্নাহর ইলম শেখা ও শেখানো, সহীহ আকীদা, সহীহ আমল শেখা ও শেখানো, হালাল-হারামের বিধান শেখা ও শেখানো এবং সেই মোতাবেক নিজের ও সংশ্লিষ্টদের পরিচালিত করার চেষ্টা করা- এটা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার এবং সংশ্লিষ্টজনদের রক্ষা করার উপায়।

এই আদেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে দান করেছেন।

কাদেরকে দান করেছেন? যারা মুমিন তাদেরকে। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করেছেন। ঈমানদাররা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ মোতাবেক চলতে হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হতে হবে। বিশ্বাস করে যে, দুনিয়াতে মানুষের কর্মের ফল আখিরাতে পেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এক দল জান্নাতী হবে, এক দল জাহান্নামী। এই বিষয়টি তারা বিশ্বাস করে। কাজেই মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা সত্যে বিশ্বাস করেছ, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আমল কর-

তাহলে মুমিনকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হয় সে আলিম হবে অথবা মুতাআল্লিম। দ্বীনের জ্ঞানী হবে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রজ্ঞাবান আলিম হবে অথবা কুরআন-সুন্নাহর ছাত্র হবে অথবা কুরআন সুন্নাহর ইলমের শ্রোতা হবে, মনযোগের সাথে, আন্তরিকতার সাথে গ্রহণের নিয়তে কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান শুনতে থাকবে। এর বাইরে- চতুর্থ প্রকারের লোক, না আলেম, না ছাত্র, না কুরআন-সুন্নাহর কথা শুনে সেই মোতাবেক নিজের জীবনকে

পরিচালিত করার চেষ্টা করে- কোনোটাই নয়; বরং চতুর্থ প্রকারের। অর্থাৎ জাহিল। এই চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছুতেই হবে না। তাহলে তো ধ্বংস হতে হবে। দুনিয়ার জীবন ধ্বংসও হবে আখিরাতের জীবনও ধ্বংস হবে।

ধ্বংস থেকে যদি বাঁচতে হয় সন্তান-সন্ততি,আত্মীয়-স্বজন,পাড়া-পড়শী গোটা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসের পথ থেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এর উপায়, কুরআন-সুন্নাহর ছাত্র হওয়া। কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা। তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'খাইর' বলেছেন, এটা এমন খাইর, এমন কল্যাণ, যার বিপরীত হল শার, অনিষ্ট-অকল্যাণ-ধ্বংস। এই কল্যাণ আমাদের অর্জন করতেই হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কী শেখায়? কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের বিশ্বাস কী হবে, আমাদের চিন্তা-চেতনা কেমন হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের ইবাদত-বন্দেগী কী হবে, তার পদ্ধতি কী হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের লেন-দেন কেমন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে। উপার্জনের কোন পদ্ধতি হালাল, আর কোনটি হারাম। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার কেমন হবে। আল্লাহর হক কীভাবে আদায় করা হবে, বান্দার হক কীভাবে আদায় করা হবে। আল্লাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে আর বান্দার সাথে কীভাবে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

কাজেই ভালো ও সজ্জন হতে হলে কুরআন-সুন্নাহর ইলমের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ উন্মুক্ত করেছেন। এই ইলমের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল অঙ্গন আলোকিত হয়। আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদত-বন্দেগী,লেনদেন,আচার-ব্যবহার সবকিছু সুন্দর হয়।

দেখুন, আকীদা, ইবাদত এই পর্যন্ত তো সহজেই বুঝে আসে। কারণ সহীহ আকীদা মানুষ জানতেই পারবে না, যদি কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন না করে। তার সঠিক বিশ্বাস কী হবে, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস, মানুষের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিশ্বাস। মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে, এ সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস অর্জনই করতে পারবে না, যদি কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের শরণাপন্ন না হয়।

ইবাদতের বিষয়টাও বুঝে আসে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত সঠিক পন্থায় যদি করতে হয় তাহলে আমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। নামাযের নিয়ম শিখতে হবে, যাকাতের নিয়ম শিখতে হবে, সওমের নিয়ম শিখতে হবে, হজ্বের নিয়ম শিখতে হবে। লেন-দেন সম্পর্কেও বুঝে আসে। কোন মুসলিম না জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান আছে? বেচা-কেনা হালাল, রিবা হারাম? এটা সকল মুসলিম জানে। তো প্রত্যেক মুসলিম মৌলিকভাবে জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান রয়েছে। হালাল মোতাবেক চলতে হলে জানতে হবে। হারাম থেকে বাঁচতে হলে জানতে হবে।

বাকি স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ- এই পর্যায়ে এসে অনেকের ভুল হয়ে যায়। পশ্চিমা শিক্ষাদর্শনের প্রভাবে মানুষের মনে এই চেতনা অনেক সময় জাগে যে, ভালো মানুষ তো সে, যার আচার-ব্যবহার ভালো। মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলে। মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। নিজের স্বার্থের উপরে অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের কিছু ভালো স্বভাব, কিছু ভালো আচরণকেই মানুষ ভালোর মানদন্ড মনে করে এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

সেই বিষয়টি হচ্ছে, যে কোনো ভালো কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা ঈমানের সাথে, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। জগতে ভালো কাজ অনেকেই করে। কিন্তু প্রথমত ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গ ভালোত্ব আসতে পারে না। এক অঙ্গনে ভালো তো আরেক অঙ্গনে ঠিক এর বিপরীত। স্ব-দেশের লোকদের জন্য ভালো কিন্তু অন্য জাতির জন্য মহা হিংস্র। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। মানুষ সামগ্রিকভাবে সবার জন্য ভালো তখনই হয় যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত ভালো স্বভাব, ভালো আচরণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা ঈমানের সাথে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়।

এটা যদি না হয়, তাহলে স্বভাব-চরিত্রগত যত ভালো গুণ রয়েছে, সেগুলো দুনিয়াতে কিছু কাজে আসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতেই কিছু সুনাম-সুখ্যাতি দান করে দেন। আখেরাতে সে কোনো বিনিময় লাভ করতে পারে না।

স্বভাব ও আচরণগত ভালো কাজগুলোও তখনই প্রকৃত ভালো হয় যখন মানুষ দ্বীন-ঈমান শেখে, আল্লাহমুখিতা অর্জন করে, আল্লাহর জন্য করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقِهُوا.

এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে আল্লাহ পাক মাটির নীচে অনেক রকমের মূল্যবান ধাতু ও মূল্যবান বস্তুর খনি তৈরি করেছেন। সোনার খনি, রুপার খনি, তেলের খনি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। সোনার খনির দাম বেশি। রুপার খনি আরেকটু কমদামী, কমদামী হলেও এটাও দামী। এরকম বিভিন্ন মানের বিভিন্ন রকম খনি মাটির নীচে আছে। এরকম মাটির উপরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

কিছু মানুষ দানশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অগ্রসর। গুণ ও যোগ্যতার মণি-মাণিক্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পর্যায়ের।

তো মানুষের মাঝে স্বভাবগত যেসকল ভালো গুণ আছে সেগুলো ভালো।

জাহেলি যুগে আরবে অনেক মানুষ ছিল, দানশীল। অনেক মানুষ ছিল মেহমানদার। অনেক মানুষ ছিল বীরত্বে শৌর্য-বীর্যে প্রসিদ্ধ। এরকমের বিভিন্ন গুণাবলী জাহেলী যুগেও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছিল। একেক পরিবার, এক এক গোত্র এক এক বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত ছিল।

উপরোক্ত হাদীসে যেন বলা হল, জাহেলী যুগে স্বভাব ও চারিত্রিক বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে যারা ভালো হিসেবে পরিচিত ছিল ইসলামেও তারা ভালো। ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এক শর্তে। সেই শর্ত হল- إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করবে। কুরআন-সুন্নাহর সহীহ ইলম অর্জন করবে এবং সে মোতাবেক তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করবে।

তাহলে জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠত্ব আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কী পার্থক্য? জাহেলী যুগে যারা ভালো ছিল, তাদের প্রাপ্তি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু সুনাম-সুখ্যাতি। তারা যেহেতু ঈমান আনেনি, ইসলাম কবুল করেনি আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই। আর ইসলামে, ইসলাম কবুল করার পরে যারা ভালো, ইসলাম কবুল করার পরে যারা শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, মেহমানদার, দানশীল, খাইরের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রগামী তাদের প্রাপ্তি হল, যেহেতু তার এই ভালো গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান মোতাবেক ব্যবহৃত হয়েছে তাই তারা এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের

কারণে দুনিয়াতেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছে, আখেরাতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সওয়াব অর্জনের উপযুক্ত হয়েছে।
তাহলে ভালো স্বভাব-আচরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ঐসময় যখন সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণায়, আল্লাহর জন্য, আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، إِذَا فَقِهُوا.

তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, আদব-আখলাকে শ্রেষ্ঠ।
এক শর্তে, সেই শর্ত কী?
إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করে।

তাহলে চিন্তা করুন, দ্বীনের ইলম, কুরআন-সুন্নাহর ইলম কত বড় কল্যাণ। কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের মাধ্যমে মানুষের গোটা জীবন শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়। গোটা জীবন আল্লাহমুখী হয়। গোটা জীবনের সকল কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক, হালাল-হারামের বিধান মোতাবেক, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সম্পন্ন হয়। এইজন্য কুরআন ও সুন্নাহর ইলম হচ্ছে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ।

وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

এই কল্যাণ আমাদের নিজেদেরকেও অর্জন করতে হবে, আমাদের সন্তানদেরকেও এর অধিকারী করতে হবে। একজন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিক্ষার চেয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের চেয়ে এবং কুরআন ও সুন্নাহর পথে পরিচালিত করার চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছুই দিতে পারেন না। এটাই বাবার পক্ষ থেকে আদরের সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার।
আমাদের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে সচেতন হতে হবে। দ্বীনী ইলম অর্জন করার, সহীহ আকীদা জানার, ইবাদতের সঠিক নিয়ম জানার, সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন কারীম পড়তে

শেখার, কুরআনে কারীম বুঝতে শেখার এবং কুরআনের আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে হবে।
এই চেষ্টা সকল শ্রেণির মানুষকেই করতে হবে। শিশু-কিশোরকেও করতে হবে, বয়স্কদেরও করতে হবে। সর্বস্তরের ইলম চর্চা ও ইলম বিস্তারের এই ধারা কীভাবে জারি হতে পারে, কীভাবে গতিশীল হতে পারে- এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে।
আমাদের কর্তব্য, আমাদের সন্তানদের একটা ভালো ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের পথে অগ্রসর করে দেওয়া। সামনের জীবনে সে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, যে পেশায় নিয়োজিত হোক- ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, যা-ই হোক না কেন, যদি তার প্রথম জীবনে শৈশবে-কৈশোরে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলে, তা বোঝার মত যোগ্যতা হয়ে যায়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখে ফেলে- তাহলে আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ সামনের জীবনে অবশ্যই এর প্রভাব পড়বে।

আমাদের এই অঞ্চলে এই ব্যবস্থা কম। কিন্তু আপনি আরবে যান, সেখানে মসজিদে হারামে, মসজিদে নববীতেও ব্যবস্থা আছে। ওখানে এমন ব্যবস্থাও আছে যে, স্কুলের বাচ্চারা সকালে স্কুলে পড়ে, বিকালে এসে কুরআনে কারীম হিফয করে। হিফযখানায় পুরো সময় দিলে হয়তো দুই-তিন বছরে পূর্ণ হিফয হয়ে যেত।
কিন্তু স্কুলের পড়ার পাশাপাশি কুরআনে কারীম হিফয করার কারণে সময় বেশি লাগছে, চার বছর পাঁচ বছর লাগছে। ওখানে ছেলেদের স্মৃতিশক্তি ভালো, ফলে আরো কম সময়ের মধ্যেও হাফেয হয়ে যাচ্ছে। স্কুলেও পড়ছে আবার কুরআনে কারীমের হাফেযও হয়ে যাচ্ছে। এরকম ব্যবস্থা আরববিশ্বে আছে। আমাদের দেশেও এরকম ব্যবস্থার বিস্তার দরকার।
আমাদের এ অঞ্চলের সাধারণ চিন্তা হচ্ছে, স্কুলে দিয়েছি তো দিয়েছি। ব্যস, কুরআন-সুন্নাহর সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য দিকে কুরআন-সুন্নাহ শিখতে এসেছে তো জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। দুই শিক্ষার মাঝে এমন দূরত্ব যে, একটাকে অবলম্বন করা হলে আরেকটা ছাড়তেই হবে; বরং সম্পূর্ণরূপেই ছাড়তে হবে। এই চিন্তাটা কতদূর সঠিক তা ভেবে দেখা দরকার। একটা পর্যায় পর্যন্ত সম্ভবত দুটোই একসাথে হতে পারে।

একজন মুসলমান কুরআনে কারীম শিখবে, কুরআনে কারীমের হাফেয হবে, কুরআন বোঝার যোগ্যতা অর্জন করবে, দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবে এরপর পছন্দমতো কোনো পেশার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষার দিকে যাবে। এমনটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের প্রভাবে ঐ পেশায় গিয়েও সে একজন মুসলিম হিসেবে তার জীবনকে পরিচালিত করতে পারবে। আল্লাহ পাক আমাদের বিষয়গুলো বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন!

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/2700/ ]

## ইলম ছাড়া আমলের পরিণাম

ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন,পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

## ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে।

**এক.** কারো লেখা পাঠ করা।

**দুই.** কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা।

এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। **প্রথম পদ্ধতির** সবচে’ বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।

-সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিকরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রহ. তাঁর ‘আলমুআফাকাত’ গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার **দ্বিতীয় পদ্ধতির** একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।
এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহর ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।
-সহীহ মুসলিম ১/১৪ {মাসিক আলকাউসার:৯}

মাওলানা ইবরাহিম খলিল রচিত *তালিবে ইলমের জীবন গঠন* কিতাবে ইলম অর্জনের দুটি পদ্ধতি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

**প্রথমত :** প্রখর স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে ইলম অর্জন হয়। যেমন – কারো স্মরণশক্তি এত প্রখর যে, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতেক, হাদীস ও ফেকাহের সব মাসআলা তার মুখস্থ। যা পড়ে বুঝে আসে আবার মনেও থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে যে ইলম অর্জিত হয় তার স্থায়িত্ব নেই।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর যুগে দুই ভাই ছিল খুবই মেধাবী। একজন আবুল ফযল, অন্যজন হলেন ফয়যী। মেধার সাহায্যে তারা ইলম অর্জন করেছেন। মেধা-প্রতিভা তাদের এমন ছিল যে, একজন বিনা নোকতায় ফার্সিতে তাফসীর লিখেছেন। পুরো তাফসীরে একটা নোকতাযুক্ত হরফও নেই। সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। তারপর নামও রেখেছেন নোকতামুক্ত হরফ দিয়ে – سواطع الإلهام

ছোট ভাইয়ের নাম ফয়যী। সে ছিল আরো মেধাবী। ফটোগ্রাফিক মেমোরির মতো যা একবার শুনত মনে থাকতো। বড়জন দুইবার শুনলে মনে রাখতে পারতো। এতো মেধা সত্বেও তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। বাদশাকে সেজদায়ে তাজীমী করা জায়েজ বলে তারাই প্রথম ফতোয়া দিয়েছে। তাদের গোমরাহির কারণ তারা মেধার জোরে ইলম শিখেছে।

**দ্বিতীয়ত :** ইবাদতের মাধ্যমে ইলম অর্জন করা। এখানে ইবাদতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমল-আখলাক ও তাকওয়া-তাহারাত। যে আমল করবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অজানা বিষয়ের ইলম দান করবেন। এমন ইলমই মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। ফাসেক তালিবে ইলম কিছু ইবারত তো শেখে, কিন্তু নূরে ইলম তাদের হাসিল হয় না। ফলে সে ইলম তেমন কাজেও আসে না।

সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাটিয়েছেন হযরত আবু হুরায়রা রা.। অথচ তিনিই ছিলেন তাদের মাঝে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস।

ইমাম বুখারি রহ. একবার অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার পেশাব পরীক্ষা করে বললেন, আপনি বোধহয় মরিচ খান না? জবাবে ইমাম বুখারি রহ. বলেন, আজ আঠারো বছর যাবত রুটি-তরকারী খাই না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কী খেয়ে বাঁচেন? জবাবে ইমাম বুখারি রহ. বলেন, পাঁচ-সাতটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিই। এ তো ছিল দেহের খোরাক। কিন্তু আত্মার খোরাক? তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। - ইলমে নাফে ২৫

## অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা

তালিবে ইলমের এসকল কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ :

১. অনর্থক তর্ক-বিতর্ক
২. অনর্থক প্রশ্নোত্তর
৩. অনুপকারী আলোচনা
৪. যুক্তি-তর্ক ও বিতর্ক অনুষ্ঠান
৫. দুর্লভ মাসআলায় আগ্রহ

৬. অনির্ভরযোগ্য কিতাবের সূত্রের প্রতি আগ্রহ
৭. উস্তাদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে শুধু নিজের অধ্যয়নের ওপর আস্থা পোষণ করা
- মুসান্নাফে, ইবন আবি শাইবা:১৯

## প্রকৃত ইলম কীভাবে লাভ হয়?

প্রকৃত ইলম তাকওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَقِيْهٌ واحِدٌ أشَدُّ عَلَى الشَّيْطانِ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ

'একজন ফকীহ শয়তানের কাছে একহাজার আবেদ থেকে বেশী ভারী'
-তিরমিজী ২৬৮১; ইবনে মাজাহ ২২৭

শুধু কিতাবী ইলম দিয়ে শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা বোঝা যায় না। বরং তাকওয়ার মাধ্যমে যে ইলম হাসিল হয় তার মাধ্যমে বোঝা যায় শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা। সে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, وَإِنَّما أنا قاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ, وَلَنْ تَزالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। নিশ্চয়ই আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দাতা। কেয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত আল্লাহর দ্বীনের ওপর কায়েম থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না'
-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

সাহাবায়ে কেরাম লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, সাক্ষর পর্যন্ত করতে পারতেন না। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাদের সম্পর্কে বলেছেন: 'اَعْمَقُهُمْ عِلْمًا' 'তারা উম্মতের মাঝে গভীর ইলমের অধিকারী'

তারা তো কোনো কিতাবাদি পড়েন নি, তাহলে কীভাবে হলেন এমন গভীর ইলমের অধিকারী? আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সোহবতের বরকতে পেয়েছেন সেই ইলম। তাকওয়ার মাধ্যমে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. -এর ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন:

اللهُمَّ فَقِّهْهُ في الدِّينِ

'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনি বুঝ ও সমঝ দান কর'

এসম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন:

شَكَوتُ اِلى وَكِيْعِ سُوءَ حِفْظِيْ ☆ فاوْصانِيْ اِلَى تَرْكِ الْمَعاصِيْ
فَاِنَّ العِلْمَ نُورٌ مِنْ اِلَهِيْ ☆ وَنُورُ اللهِ لا يُعْطِيْ لِعاصِيْ

' আমি ইমাম ওয়াকীর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি জবাবে বলেন, গোনাহ ছেড়ে দাও। কেননা ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর যা কোনো গোনাহগারকে দেয়া হয় না'

সেটা কেমন ইলম গোনাহ যার প্রতিবন্ধক? কিতাবী ইলমের জন্য তো গোনাহ প্রতিবন্ধক নয়। কাফের ফাসেকও অর্জন করতে পারে কিতাবী ইলম। সুতরাং বোঝা গেলো, ইমাম শাফেয়ী রহ. কিতাবী ইলমের অভিযোগ করেননি, বরং অভিযোগ করেছেন প্রকৃত ইলমের।

❒ **মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ হাফি. এক মজলিশে ইলম হাসিলের পথ সম্পর্কে বলেন:** অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না ইলম আসার পথ কোনটা? এই কথাটা বলার জন্যই বসেছি। যেটা ইলম আসার পথ নয়, অনেক সময় আমরা সেটাকে ইলম আসার পথ মনে করে মেহনত করতে থাকি। আর যত মেহনত করি তত ইলম থেকে দূরে সরি। কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা।

আর যে পথে ইলম আসার কথা ঐটাকে ইলমের পথ মনে না করে ছেড়ে দেই। ঐ পথ থেকে দূরে সরে যাই। এ জন্য এইগুলো আসলে বেশি জানা দরকার। শুধু কিতাব পড়া ও বিভিন্ন মা'লুমাত হাসিল করা, ইলম আসার পথ নয়।

ইলম আসার আসল পথ কোনটা, এটা বুঝা দরকার। তো ইলম আসার পথ অনেক। ইলম না আসার পথও অনেক।

ইলম আসার সবচেয়ে বড় পথ হল *'খিদমতে খালক'* মানুষের খিদমত করা। যে তালিবে ইলম আল্লাহর মাখলুকের বিশেষ করে, ইনসানের, বিশেষ করে মুমিন বান্দার খেদমত করবে তার জান-মালের হেফাযত করবে, ইযযত-আবরুর হেফাযত করবে তার জন্য ইলমের রাজপথ খুলে যাবে।

দেখ, আমাদের অনেকেরই এই অভ্যাস আছে, অন্তত এতটুকু আমরা করেই ফেলি যে, কারো একটা দোষ দেখলে অন্যের কাছে বলে দেই। এটা ইজ্জতের ক্ষতি। অথচ যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়, মানুষের মনে কষ্ট জাগে, পশু-পাখির মনে কষ্ট জাগে, কুকুর-বিড়ালের মনে কষ্ট জাগে, তার জন্য ইলমের সবকটা দরজা বন্ধ।

আমরা মনে করছি, কিতাবের মধ্যেই ইলম। আসলে তা নয়। ইলম আসলে কলবের মধ্যে। আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে ইলম ঢালেন। আগের যুগেও ঢেলেছেন, খায়রুল কুরূনেও ঢেলেছেন।

সর্বপ্রথম তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবে ইলম ঢেলেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সোহবতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের কলবে ইলম ঢেলেছেন। এভাবে প্রতি যুগে মুমিন বান্দার কলবে আল্লাহ তাআলা ইলম ঢেলেছেন। এটা এ যুগেও অব্যাহত রয়েছে। তবে এ যুগে এযুগের মতো করে ঢালা হয়।

আগামীতে তোমরা যারা খেদমতের দায়িত্ব নেবে তোমাদের কলবেও আল্লাহ তাআলা ইলম ঢালবেন। কিতাবের পাতা থেকে ইলম আসবে না। আল্লাহ তোমার কলবে ইলম ঢালবেন। হাদীসের কথা শুনোনি,

এটা আল্লাহ তাআলা কখন ঢালবেন? অনেকগুলো আসবাব আছে, এর মধ্যে একটা বড় জিনিস হল *খিদমতে খালক* । মানুষের খেদমত করা। পশু-পাখির খেদমত করা। কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

এই যে, দেওবন্দ মাদরাসার মুফতিয়ে আযম, মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব। ১০-১২ খন্ডে তার ফতোয়ার কিতাব আছে। পুরো হিন্দুস্তানের মধ্যে তাকে মুফতীয়ে আযম বলা হত। এলাকায় কয়েকজন বিধবা ছিলেন, তাদের বাজার-সদাই করার মতো কেউ ছিল না।

তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় যখন রওনা দিতেন, তখন তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলতেন, তোমার কী সদাই লাগবে বল। আমি বাজারে যাচ্ছি।

কল্পনা করতে পার, তার শত শত তালিবুল ইলম ছিল। কাউকে বললেই হত। কিন্তু তিনি ভেবেছেন যে, অন্যকে দেব কেন? এটা তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। আমি এই সৌভাগ্য নেব না কেন। তিনি বিধবাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের বাজার-সদাই করে দিতেন। দীর্ঘদিন তিনি এই খেদমত করেছেন। তিনি কি শুধু কিতাব পড়ে মুফতীয়ে আযম হয়েছেন? কিতাব তো আরো কতজন পড়েছে? তিনি মুফতী আযম হয়েছেন খিদমতের দ্বারা।

এটা অনেক বড় বিষয়। তাঁর মতো না পার তোমার সঙ্গে যে তালিবুল ইলম আছে, যে পড়া পারে না, তাকে পড়াটা একটু বুঝিয়ে দাও। এই নিয়তে যে, 'সে আল্লাহর বান্দা, তার খেদমত করলে আল্লাহ তাআলা আমাকে ইলম দান করবেন'। এদ্দুরও না পার অন্তত সে পড়া না পারলে তুমি যে বিরক্ত হও, তা হয়ো না। হুজুর তাকে বুঝাচ্ছেন, তুমি বুঝে ফেলেছো। এজন্য তুমি বিরক্ত হচ্ছ যে, এর কারণে পড়া আরো বিলম্ব হচ্ছে। তুমি বিরক্ত হয়ো না। নিয়ত কর, তাকে বুঝানোর জন্য হুজুর সময় ব্যয় করছেন। আমার সময়টাও ব্যয় হচ্ছে। আল্লাহ তুমি বরকত দান কর।

আরেকটা কথা সব সময় বলি। হুজুর কিভাবে বুঝান এটাও শিখতে থাক। এতক্ষণ কিতাবের তাআল্লুম করেছ। এখন তা'লীমের তাআল্লুম কর। একজন না বুঝলে উস্তাদ তাকে কিভাবে বুঝান এই কৌশলগুলো শেখার চেষ্টা কর।

যাক, এটা তো যাহেরী সববের কথা। আমি তো বাতেনী সববের কথা বলছি যে, তুমি বিরক্ত  না হলে সহপাঠীর খিদমত হল। এতটুকু খেদমত কর। সহপাঠী ভুল করেছে। এমন একটা ভুল, যা তার করার কথা না। এক সঙ্গে চার-পাঁচজন, দশ-বারজন হেসে উঠলে। এগুলো তো হয়। এটা করে কেন তাকে অপ্রস্তুত করছ! তাকে কেন লজ্জিত করছ?

বরং শোকর আদায় কর। আল্লাহ, তুমি আমাকে তাওফীক না দিলে আমি বুঝতাম না। আল্লাহ! তুমি আমার এই ভাইকেও তাওফীক দাও। দেখ, তোমার দুনিয়া কীভাবে বদলে যায়। তোমার ইলমের রাস্তা কীভাবে খুলে যায়। এইগুলো হল ইলম আসার পথ। কিন্তু মানুষ এইগুলোকে ইলম আসার পথ মনে করে না। অথচ যদি এই রাস্তাগুলি মানুষ অবলম্বন করে। তখন এক ঘণ্টা কিতাব পড়লে হাজার ঘণ্টার ফায়দা হবে। এটা তো শরীয়তের মেযাজ।

অল্প মেহনতে বেশি দান করা। শরীয়ত বেশি মেহনত চায় না। শরীয়ত চায় মেহনত অল্প হোক, কিন্তু তা যেন হয় আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। তখন এক ঘণ্টার ইলম চর্চা এক হাজার ঘণ্টার ইলম চর্চার সমান হবে। এক হাজার ঘণ্টা কি কেউ পড়তে পারে? আমি মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে হিসাব দেই। এই যে, আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ পড়ছ, কুদূরী পড়ছ, হেদায়া পড়ছ। আসলে কয় ঘণ্টা পড়ছ। সারা বছরে কয় ঘণ্টা পড়? এই কয়েক ঘণ্টায় ফিকহের মতো শাস্ত্র, এত বড় একটা ইলম কি এসে যেতে পারে? কোনোভাবেই পারে না। হেদায়া যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা পড়ি, আর না হয় আরো এক ঘণ্টা তাকরার ধরি। তাহলে দুইশ চল্লিশ ঘণ্টা হবে। মাত্র দুই শত চল্লিশ ঘণ্টা পড়ে এত বড় ইলম হাসিল হয়ে যাবে! দুইশ চল্লিশ ঘণ্টা মানে দশ দিন। তো দশ দিন পড়ে তোমার ইলমুল ফিকহ হাসিল হয়ে যাবে। কিছুতেই নয়। হ্যাঁ, যদি এই দশ দিনকে, দুইশ চল্লিশ ঘণ্টাকে আল্লাহ যদি দুই হাজার চারশ ঘণ্টা করে দেন। তাহলে ইলম হাসিল হবে। কিন্তু আমরা তো দুইশ চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই ঘণ্টারও বরকত পাই না। দুইশ চল্লিশ ঘণ্টা কিতাব নিয়ে বসে থাকি, কিন্তু বদ আমলির কারণে দুই ঘণ্টারও বরকত পাই না। আর আমাদের পূর্ববর্তীরা দুইশ চল্লিশ ঘণ্টা পড়ে দুই হাজার চারশ ঘণ্টার বরকত পেতেন। বরকত পেতেন কোন পথে? বরকত পেতেন এই খিদমতে খালকের পথে। মানুষের খেদমত কর। দেওবন্দের মুফতী আযমের মতো খেদমত যদি করতে না পর অন্তত কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। এই যে হাদীস শরীফে আছে,

"ভালো কথা বল, অথবা চুপ থাক"

চুপ থাকাও সদকা। তো তুমি তোমার সহপাঠীকে কষ্ট দিও না। তার জিনিস না বলে নিয়ো না। অন্য জায়গায় রেখে দিও না। কটু কথা বলো না। নিজে বেশি জায়গা নিয়ে তার জায়গাটা সংকুচিত করে দিয়ো না। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো যদি তোমরা করতে পার তাহলে তোমাদের জন্য ইলমের রাজপথ খুলে যাবে। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আমার নিজের জীবনেও কিছু ঘটনা আছে। ভয়ে বলছি না। আল্লাহ তাআলা আমাকে যা কিছু দান করেছেন, আমার মনে হয়-কিছু পশু-পাখি ও কিছু গরীব মানুষের দুআর বরকতে দিয়েছেন। এটা আমার বিশ্বাস।

আর মা-বাবার দুআ, আসাতিযায়ে কেরামের দুআ সে তো অন্য মওযূ। আমি মনে করি, কোনো যাহেরী সবব যদি থেকে থাকে তাহলে ঐগুলির দ্বারা আল্লাহ তাআলা সে সবগুলো দান করেছেন।

গরীব মানুষকে কেউ 'আপনি' করে বলে না। 'তুমি' আর 'তুই' করে বলে। তাদেরকে 'আপনি' বলার, তাদেরকে ইজ্জত করার কিছু বরকত আছে। তারা যদি কখনো বেইজ্জতি করে, তাহলে ঐ বেইজ্জতির উপর সবর করার মধ্যেও বরকত আছে। কী জান? কারণ সবাই ওদের চেয়ে শক্তিশালী। ওরা কারো কাছ থেকে ইজ্জত পায়ই না। সবার কাছ থেকে বেইজ্জতি পেতে থাকে। তো ওরা যখন ওদের চেয়ে নিরীহ কাউকে পায় তখন ইচ্ছে হয় প্রতিশোধ নেওয়ার।

এটা ফিতরতে ইনসানী। মানুষের স্বভাব। তাই কোনো হুজুর পেলে দুর্ব্যবহার করে সুখ পেতে চায়। তার মনে এ ধরনের ভাবনার উদয় হয় যে, সবাই আমাকে তুই-তুকারি করে তা নয়। আমিও কাউকে তুই তুকারি করতে পারি। তো তুমি এসবক্ষেত্রে সবর কর। আল্লাহর বান্দাকে একটু খুশি হতে দাও। আমি তোমাদেরকে ইলমের রাস্তা দেখাচ্ছি। দুনিয়ার মানুষ  এগুলিকে ইলমের রাস্তা মনে করে না। এবং এগুলি থেকে দূরে থাকে।

তালিবে ইলম কি মানুষের সাথে ঝগড়া করতে পারে? সে তো মানুষের দুর্ব্যবহারে সবর করবে। এটা তার ইলম আসার রাস্তা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জানের দুশমনকেও মাফ করে দিয়েছেন। এই রাস্তা বাদ দিয়ে তুমি কোন রাস্তায়ই ইলম হাসিল করবে? তোমাকে ঐ রাস্তায়ই ইলম হাসিল করতে হবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাওফীক দান করেন।

শেষকথা

এশার আগে আল্লাহর এক বান্দার একটু উপকার করেছিলাম। আল্লাহ উপকার করার তাওফীক দিয়েছেন। আবার উপকারের পুরস্কারও দিয়েছেন। হঠাৎ করে কিতাব খুলেছি। কিতাব খুলেই একটি উর্দূ কবিতা পেলাম। কবিতাটা পড়ে আমার ভিতরে একটা ঢেউ উঠেছে। এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেগুলো ঐ কবিতারই মাযমূন। কবি বলেছেন-

"সবাই তো লাভ চায়। ক্ষতি থেকে বাঁচতে চায়। সবাই মনে করে যে, অন্যকে যত ঠকাতে পারি ততই আমার লাভ। আর নিজে যত ঠকি ততই আমর ক্ষতি। সুতরাং আমি যেন না ঠকি। অন্যকে যেন ঠকাতে পারি"। যারা নিজের ক্ষতি করে অন্যের লাভ করে, সবাই তাদেরকে বলে পাগল। তো কবি বলেছেন যে, আমি এই 'দরসে জুনূন' গ্রহণ করেছি। লাভ-ক্ষতির এই পৃথিবীতে আমি পাগল হওয়ার শিক্ষা নিয়েছি। সেই শিক্ষাটা কী?

নিজের যত ক্ষতি হয় হোক, কিন্তু অন্যের ক্ষতি যেন না হয়। এতেই আমার লাভ। এটা যদি করতে পারি তাহলেই আমি লাভবান। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/en/article/343/ ]

## ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয়?

ইলম সংরক্ষিত হয় আমলের মাধ্যমে। কথায় বলে:

العِلْمُ صَيْدٌ وَالعَمَلُ قَيْدٌ

'ইলম হলো শিকার আর আমল হলো বেড়ি'

তাই ইলমকে আমলের ছাঁচে ঢালা উচিত। আবার আমলও হওয়া চাই সুন্নাত মোতাবেক। সুন্নাত হলো পোষ্ট অফিসের সিলের মত। সিল ছাড়া চিঠি যেমন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে না, সুন্নাত ছাড়াও আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। -তালিবে ইলমের জীবন গঠন ৫৮-৫৯

❒ সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন, পড়তেন না

সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন, পড়তেন না । খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সাহাবায়ে কেরাম কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সামনে কিতাব নিয়ে বসেননি। তিনি কখনো কাউকে কোনো কিতাব পড়াননি। বরং তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিশে বসতেন। এতেই তাদের ইলম বৃদ্ধি পেতো, ঈমান আমল সমৃদ্ধ হতো।

-তালিবে ইলমের জীবন গঠন ৬২

## কিতাবের প্রতি ভালোবাসা

কিতাব মানুষকে আলোকিত করে। সুন্দর জীবনের পথ দেখায়। অতীতের সাথে বর্তমানের সেতুবন্ধন হচ্ছে কিতাব। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে উলামায়ে কেরাম ইলমের যে বাগান সাজিয়েছেন তার পুষ্পসৌরভে মোদিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল কিতাব।

কোনো কোনো কিতাব মানুষের মনোজগতকে উজ্জীবিত করে। চেতনাকে শাণিত করে। মানবিকতা জাগিয়ে তোলে। কখনো একটি কিতাবই হতে পারে জীবন পরিবর্তনের কারণ। কিতাবকে বলা যায় মানুষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। কিতাব অধ্যয়নের প্রশংসা করতে গিয়ে একজন মনীষী বলেন,

"কিতাব আপনার সর্বোত্তম বন্ধু। কিতাব আপনাকে আলোর পথ দেখাবে। জীবন পথের পাথেয় যোগাবে। কিতাবের সান্নিধ্য আপনাকে অসীম দিগন্তে নিয়ে যাবে এবং অজানা রহস্য মেলে ধরবে। কিতাব মানুষের আত্মার খোরাক। তাই আরামপ্রিয় ও অলসদের সঙ্গ ছেড়ে কিতাবের সঙ্গ গ্রহণ করুন।"

কিতাবের ভালবাসা যখন কারো হৃদয়ে স্থান করে নেয় তখন অন্য সব ভালবাসা ম্লান হয়ে যায়। আমাদের আকাবিরদের হৃদয়ে ঠিক এমন ভালবাসা ছিল কিতাবের প্রতি।

## অকল্পনীয় মুতালাআ

কিতাব মুতালাআ করে অনেকেই। ছোট ছোট কিতাব পেলে একটু আগ্রহ করে পড়ে, কিন্তু কিতাব কিছুটা দীর্ঘ হলেই আগ্রহের জোয়ারে ভাটা পড়ে। আর যদি তা  হয় কয়েক খণ্ডের তবে তো হিম্মত আরো কমে যায়।

তবে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহ. (মৃত্যু : ৭০২ হি.) হতে পারেন এক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণার উৎস।
তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র। তবে তা এমনিই হয়ে যায়নি; বরং রাত-দিনের একনিষ্ঠ অধ্যয়ন তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে ইলমের সর্বোচ্চ শিখরে। যেখানে খুব কম মানুষই পৌঁছাতে পারে।

আদফুবী রাহ. বলেন, তার মুতালাআর ক্ষমতা ছিল অকল্পনীয়। আমি আলমাদরাসাতুন নাজীবিয়্যাহ-এর লাইব্রেরি ঘুরেছি। সেখানে অনেক গ্রন্থ ছিল। ইবনুল কাসসারের 'উয়ূনুল

আদিল্লাহ’ও ছিল সেখানে। ত্রিশ খণ্ডের এই বিশাল কিতাবের পাতায় পাতায় দেখেছি তার (ইবনু দাকীকিল ঈদ) কলমের দাগ।

আলমাদরাসাতুস সাবেকীয়্যাহতেও যাওয়া হয়েছিল আমার। বাইহাকী রাহ.-এর ‘আসসুনানুল কুবরা’ ছিল সেখানে। এই বিশাল গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডেই আমি তার কলমের দাগ দেখেছি। তাছাড়া তারীখে বাগদাদ, মুজামুত তবারানী আলকাবীর, আলবাসীত লিল ওয়াহিদীতেও দেখেছি তার কলমের দাগ। (আততালিউস সায়ীদ, পৃষ্ঠা ৫৮০)

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন। এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে যাদের সামান্য জানাশোনা আছে তারা জানেন একেকটি গ্রন্থের কলেবর কত বৃহৎ। আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন তো দূরের কথা শুধু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পুরো কিতাবের ঘ্রাণ নিয়েছেন এমন মানুষ এ যুগে খুব কম পাওয়া যাবে, কিন্তু এ মহান মনীষী এ পুরো কিতাব অধ্যয়নের সাথে সাথে পাতায় পাতায় এঁকে গেছেন মুতালাআর চিহ্ন।

সিরাজুদ্দীন রাহ. বলেন, আল্লামা রাফেয়ী রাহ.-এর ‘আশশারহুল কাবীর’ যখন প্রকাশিত হয় তিনি তা এক হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেন। এরপর তিনি শুধু নামায পড়া ছাড়া বাকি সময় কিতাব মুতালাআয় নিমগ্ন থাকতেন। এভাবেই শেষ করেন পুরো কিতাব। (প্রাগুক্ত)

ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহ.-এর বেশির ভাগ সময় অর্থকষ্ট লেগেই থাকত। সম্পদের প্রাচুর্য তার ছিল না। তাই ঋণ করেই অনেকসময় কিতাব ক্রয় করতেন।

### কিতাব সংগ্রহের নেশা

মানুষের সখের শেষ নেই। একেকজনের সখ একেক রকম। কারো সখ ঘুরে বেড়ানো। আবার কারো বই পড়া। আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনুল খাশশাব আননাহবী রাহ. (মৃত্যু : ৫৬৭)-এর শখটি ছিল বই সংগ্রহ করা। সাথে অবিরাম মুতালাআ তো আছেই।

ইবনুন নাজ্জার বলেন, কোনো আহলে ইলম মারা গেলেই ইবনুল খাশশাব রাহ. তার সকল কিতাব কিনে ফেলতেন। এভাবে মাশায়েখদের অনেক কিতাব জমা হয়েছিল তার কাছে। তার হাতে সবসময় কিতাব থাকত। আর তিনি নিবিষ্ট চিত্তে অক্লান্তভাবে সারাদিন মুতালাআয় ডুবে থাকতেন। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃষ্ঠা ৩২১)

ইবনুল আখদার রাহ. বলেন, আমি একদিন উসতাদজীর কাছে যাই। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তবুও বুকে কিতাব রেখে মুতালাআ করছিলেন। আমি বললাম, এ কী? তিনি বললেন, ইবনে জিন্নী নাহুর একটা মাসআলা বলে শে'রের একটি পংক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তবে ব্যপারটা খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করতে পারেননি। অথচ এ মাসআলার সমর্থনে আমার সত্তরটি পংক্তি জানা আছে। (শাযারাতুয যাহাব ৬/৩৬৬)

**বাড়ি বিক্রি করে কিতাব সংগ্রহ..**

কিতাব সংগ্রহের জন্য কি কেউ তার বাড়ি বিক্রি করতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে তা অসম্ভব। তবে এক কিতবাপ্রেমী কিতাবের ভালবাসায়  এ অসম্ভবকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন।

ইবনুল খাশশাব রাহ. একবার কিতাবের বাজারে গেলেন। তখন একটা কিতাব খুব পছন্দ হল তার। তবে দামটা একটু বেশি। পাঁচশত দিনার। অত টাকা তার সংগ্রহে ছিল না তখন। তবুও তিনি কিতাবটি কিনে ফেললেন। বিক্রেতার কাছে দাম পরিশোধের জন্য তিন দিন  সময় নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। গিয়েই ঘটালেন এক অবাক কাণ্ড। বাড়ি বিক্রির জন্য ডাক উঠালেন। একজন পাঁচশত দিনার বলতেই নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি বিক্রি করে দিলেন। এরপর সে টাকা দিয়ে পরিশোধ করলেন কিতাবের মূল্য! (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃষ্ঠা ৩২১-৩২২)

প্রিয় পাঠক! আপনি কি ভেবেছেন ইসলামী ইতিহাসে এমন ঘটনা একটাই ঘটেছে? না, বরং এর নযীর আরো আছে। কিতাবের প্রতি এই প্রেম ও হৃদয়ের টানের কারণেই তো সে যুগে আমরা ছিলাম পৃথিবীর সর্বোন্নত সভ্যতার ধারক-বাহক।

আবুল আলা হাসান ইবনে আহমাদ বিন সাহল আলআত্তার রাহ. (মৃত্যু : ৫৬৯ হি.)। তিনি ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান। বাবা ব্যবসা করতেন। তাই বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে অঢেল সম্পদ লাভ করেছিলেন। তবে এগুলো দ্বারা তিনি বিলাসিতা করেননি। পুরোটাই ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

একদিনের ঘটনা। বাগদাদে ইবনুল জাওয়ালিকী রাহ.-এর কিতাবসমূহ বিক্রি হচ্ছিল। আবুল আলা রাহ.-ও সেখানে গেলেন। কিছু কিতাবের তখন দাম হাঁকা হল ষাট দিনার। তিনি তা কিনে ফেললেন। তবে দাম পরিশোধের জন্য সময় চাইলেন এক সপ্তাহ। সাথে সাথে রওয়ানা দিলেন মাতৃভূমি হামাযানের দিকে। বাড়ি পৌঁছে বাড়ি বিক্রির ঘোষণা দিলেন। একজন ষাট দিনারের কথা বলল। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। আশপাশের লোকজন বলল,  এ বাড়ির দাম তো আরো বেশি হবে। তিনি বললেন, না, এ দামেই বিক্রি করব। তখন ষাট দিনারেই বাড়ি বিক্রি করে দেয়া হল। অর্থ নিয়ে তিনি আবার ছুটলেন বাগদাদের দিকে। বাগদাদ থেকে হামাযান। আবার হামাযান থেকে বাগদাদ আসা-যাওয়ার মাঝেই কেটে গেল এক সপ্তাহ। এসে তিনি কিতাবের দাম শোধ করে দিলেন। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃ. ৩২৩)

৫৬৯ হিজরীতে এই মহান মনীষী ইন্তেকাল করেন। একজন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি একটি শহরে, যার সবগুলো দেয়াল তৈরি করা হয়েছে কিতাব দিয়ে। আবুল আলা রাহ.-এর চারপাশেও অসংখ্য কিতাব। তিনি গভীর নিমগ্নতায় সেগুলো মুতালাআ করছেন। স্বপ্নেই তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এর রহস্য কী? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আরজি জানিয়েছি, দুনিয়াতে আমি যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম এখানে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকার সুযোগ তিনি যেন আমায় করে দেন। আল্লাহ তাআলা আমার এ চাওয়া কবুল করেছেন। (প্রাগুক্ত)

হে আল্লাহ! কিতাবের প্রতি এমন ভালবাসা, এমন পাঠনিমগ্নতা আমাদেরকেও নসীব করুন- আমীন।

**ঈদের দিনেও পাঠনিমগ্নতা**

ঈদের দিন কী করি আমরা? খাওয়া-দাওয়া, ঘুরা-ফেরা এই তো! কিন্তু বই পড়া, কিতাব মুতালাআর চিন্তা কি করি কখনো? না।

মূসা বিন মুহাম্মাদ রাহ. একসময়ের জ্ঞানরাজ্য আন্দালুসের বিখ্যাত মনীষী। তার ছেলে আবুল হাসান রাহ. বাবার সম্পর্কে বলেন, বাবা ৬৭ বছর জীবিত ছিলেন। তবে কিতাব মুতালাআ ও লেখালেখি ছাড়া একটা দিনও তিনি অতিবাহিত করেননি। এমনকি ঈদের দিনও এ ধারা অব্যাহত থাকত। একবার ঈদের দিন আমি তার কামরায় যাই। তিনি তখন লিখছিলেন। আমি বললাম, বাবা! আজ ঈদের দিনও আপনি বিশ্রাম করবেন না? তিনি তখন চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। মনে হল যেন আমার উপর রাগ করেছেন। বললেন, আমার মনে হয় তুমি জীবনে সফল হতে পারবে না। তুমি কি এ ভিন্ন অন্য কিছুর মাঝে আনন্দ খুঁজে পাও? খোদার কসম এর চেয়ে অধিক আনন্দের কাজ আমার জানা নেই। (নাফহুত তীব মিন গুছনিল আন্দালুস আররাতীব ২/৩৩৪)

আহ! আমরাও যদি মুতালাআয় এমন আনন্দ খুঁজে পেতাম। লেখালেখি ও অধ্যয়নের মাঝে এমন প্রশান্তি যদি আমাদেরও অনুভব হত। তাদের মত কিংবা তার কিছু অংশ।

**বদ্ধ ঘরে তিন বছর!**

সানাদ ইবনে আলী বলেন, আমার বাবা খলীফার রাজদরবারে কাজ করতেন। খলীফাও তাকে অনেক ভালবাসতেন। উকলিদাসের পাঠ শেষ করে আমি মিজাসতী কিতাব পড়া শুরু করতে চাইছিলাম। তবে কিতাবটি ছিল না আমার কাছে। বাগদাদে তখন এক লিপিকার এ কিতাব বিশ দিনারে বিক্রি করত। আমি বাবাকে বললাম তা কিনে দেয়ার

জন্য। বাবাও কিনে দেয়ার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু দিব দিচ্ছি করে করে অনেক দিন হয়ে গেলেও আর কিনে দিলেন না।

আমার এক ভাই ছিল। আমার মত পড়াশোনার এত আগ্রহ তার ছিল না। বাবার সাথে বিভিন্ন কাজ করত। একদিনের ঘটনা। বাবা কোনো একটা কাজে গিয়েছিলেন এক জায়গায়। আমিও সাথে গেলাম সেদিন। বাবা ভেতরে কাজ সারার সময়টাতে বাহনজন্তুকে ধরে রাখাই ছিল আমার কাজ। বয়স আমার তখন মাত্র সতের বছর। বাবা ভিতরে যাওয়ার পর এক ছেলে এসে আমাকে বলল, তোমার বাবা অনেক সময় এখানে অবস্থান করবেন। তাই তুমি চলে যাও। আমি তখন বাহনজন্তুটা নিয়ে সোজা বাজারে চলে গেলাম। বাবাকে না জানিয়েই তা তিরিশ দিনারের কিছু কমে বিক্রি করে দিলাম। এরপর বিশ দিনার দিয়ে মিজাসতী কিতাবটা কিনে বাড়ি ফিরে এলাম। মাকে এসে বললাম, আজ খুব বড় একটা অপরাধ করেছি। এরপর পুরো ঘটনা শুনিয়ে মাকে কসম দিয়ে বললাম। বাবা যদি এ কারণে আমার উপর রাগ করেন তবে তোমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব আমি। একথা বলে অতিরিক্ত মূল্যটা মাকে ফেরত দিয়ে দিলাম। বাড়িতে আমার একটা ঘর ছিল। সেখানে একাকী থাকতাম আমি। মাকে বললাম, ঘরে ঢুকে আমি দরজাটা লাগিয়ে দেব। কিতাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর বের হব না। তোমার কাছে অনুরোধ, প্রতিদিন একটা মাত্র রুটি বাহির থেকে আমার ঘরে নিক্ষেপ করবে। কয়েদিকে যেমন খাবার দেয়া হয় সেভাবে।

মা আমাকে বাবার দিকটি দেখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন। আমি এরপরই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এদিকে আমার ভাই বাবার কাছে গিয়ে সব বলে দিল। শুনতেই বাবার মুখের রং বদলে গেল। উপস্থিত অন্যদের চোখ থেকে ব্যাপারটা এড়াল না। জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী? একটা খবর শুনেই আপনি এমন বদলে গেলেন কেন? বলুন তো কী হয়েছে? বাবা আমার ঘটনা বললেন, অন্যরা বলল, বাহ্! আপনি তো অনেক ভালো একটি সন্তান লাভ করেছেন। এমন ছেলে ক'জনের ভাগ্যে জোটে। আপনি আপনার ছেলেকে কিছুই বলবেন না। আর এই নিন আগেরটার চেয়ে অনেক সুন্দর একটা বাহন আপনাকে দিচ্ছি।

সানাদ ইবনে আলী বলেন, আমি সেই ঘরে তিনটা বছর এক দিনের মত কাটিয়ে দিলাম! (আলমুকাফাআহ্ পৃ. ১১৯; সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃ. ২৭৫-২৭৭)

**আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আসসিলাফী রাহ. (মৃত্যু : ৫৭৬ হি.)-এর পাঠনিমগ্নতা**

আবদুল কাদের রুহাবী বলেন, সিলাফী রাহ. ইসকান্দারিয়া থাকা অবস্থায় একদিন শুধু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। তিনি সবসময় মাদরাসাতেই থাকতেন। আমরা যখনই তার কাছে যেতাম দেখতাম তিনি মুতালাআয় নিমগ্ন।

আওকী রাহ. বলেন, সিলাফী রাহ. আমাকে বলেছেন, আমার এখন ষাট বছর, অথচ এ দীর্ঘ সময়ে আমি একবারের জন্যও ইসকান্দারিয়ার প্রসিদ্ধ মিনার দেখতে যাইনি। (অথচ এটা ছিল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি) হ্যাঁ, মাদরাসার জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় এতটুকুই।

হাফেয আবদুল আযীম মুনযিরী রাহ. বলেন, সিলাফী রাহ.-এর কিতাব সংগ্রহের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। যা অর্থ আসত কিতাব কিনেই খরচ করে ফেলতেন। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃ. ৯৩)

## কিতাবপ্রেমী তিন মনীষী

আবু হাফফান রাহ. বলেন, তিন ব্যক্তির মত কিতাবপ্রেমী আমি আর কাউকে দেখিনি। জাহেয, আলফাৎহ ইবনে খাকান, ইসমাঈল বিন ইসহাক আলকাযী।

**এক. জাহেয (মৃত্যু : ২৫৫ হি.)**

জাহেয এতটাই কিতাবপ্রেমী ছিলেন যে, কোনো কিতাব পেলেই তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন। কিতাবটা যে বিষয়েরই হোক না কেন। অনেকসময় বই বিক্রেতাদের দোকান ভাড়া নিয়ে রাত জেগে কিতাব মুতালাআ করতেন।

## দুই. আলফাৎহ ইবনে খাকান (মৃত্যু : ২৪৭ হি.)

সবসময় ইবনে খাকানের হাতে কোনো না কোনো কিতাব থাকত। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ কিংবা নামাযের জন্য মুতাওয়াক্কিলের মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন হলে হাঁটতে হাঁটতেই কিতাব মুতালাআ করতেন। মসজিদ কিংবা হাম্মামে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চলত অধ্যয়নের এ ধারাবাহিকতা। প্রয়োজন শেষে মজলিসে ফিরে আসা পর্যন্ত আবার শুরু হত অধ্যয়ন। মুতাওয়াক্কিল কোনো প্রয়োজনে উঠে গেলে ফেরার আগ পর্যন্ত আবার কিতাব মুতালাআ শুরু করতেন।

## তিন. ইসমাঈল ইবনে ইসহাক আলকাযী (মৃত্যু : ২৮২ হি.)

আমি যখনই তার কাছে গিয়েছি দেখেছি তিনি মুতালাআ করছেন। কিংবা মুতালাআর জন্য কিতাব খুঁজছেন কিংবা কিতাবের ধুলো-ময়লা ঝাড়ছেন।
(তারীখুল ইসলাম, যাহাবী খ. ৫, পৃ. ১১৯৩, জীবনী নং ৩৪৫-এর অধীনে)

## কাপড় বিক্রি করে কাগজ ক্রয়

কিতাব পড়ি আর না পড়ি কিন্তু কিতাব কেনার শখ আছে আমাদের অনেকেরই। কারণ কিতাব কিনে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখাটা এখন ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যপারটা অনুচিত। কিতাব কেনা উচিত পড়ার জন্য। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয়।

যাই হোক কিতাব কেনার এ আগ্রহটা কিন্তু পকেটে টাকা থাকলেই প্রবল থাকে। টাকা থাকার অর্থও আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা। আমাদের অনেকের অবস্থাই এমন। তাই আসুন সামনের ঘটনাটা পড়ে আমাদের এই অবস্থার সংশোধন করা যায় কি না।

আবু জাফর ইবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু : ৩২১ হি.) ছিলেন অনেক বড় ফকীহ। সেইসাথে খোদাভীরু মুত্তাকী। সবসময় ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন।
আবু বকর মালেকী বলেন, তিনি (আবু জাফর) একবার 'সূসা' শহরে একটি কিতাব দেখেন। কিতাবটি পছন্দ হয় তার। কিন্তু অনুলিপি করার মত কাগজ তার কাছে ছিল না। কাগজ কিনবেন- পকেটে সেই টাকাও নেই। অবশেষে পরিধেয় কাপড়টাই তিনি বিক্রি করে ফেলেন। সে কাপড়বেচা টাকা দিয়ে কাগজ কিনে পুরো কিতাব অনুলিপি করে নেন। এরপর কায়রাওয়ানে ফিরে আসেন গর্বের ধন কিতাবটিকে বুকে নিয়ে। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃ. ১৯৪)

ঠিক এমন একটি ঘটনা ঘটেছে শায়েখ আহমাদ ইবনে কাসেম আলহাজ্জারের (মৃত্যু : ১২৭৮ হি.) সাথেও। একবার একটা কিতাব বিক্রি হচ্ছিল। কেনার মত অর্থ তখন তার কাছে ছিল না। তাই পরিধানের কাপড় থেকে একটা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়েই কিতাবটি ক্রয় করেন। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃ. ২৭৮)

ইমাম আবু যুরআ রাযী রাহ. (মৃত্যু : ২৬৪ হি.) হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম। হাদীসের আলোয় আলোকিত এ মহা মনীষী হাদীস শাস্ত্রে লাভ করেছেন আকাশ ছোঁয়া মর্যাদা। আকাশের এই উচ্চতায় তিনি এমনিই পৌঁছে যাননি। কষ্টের সিঁড়ি বেয়ে তবেই পৌঁছেছেন সেখানে। ত্যাগের এমন একটি ঘটনা তার মুখেই শুনুন-

আমি রায় শহর থেকে ইলম অর্জনের জন্য দ্বিতীয়বার বের হয়েছিলাম ২২৭ হিজরীতে। আর ফিরে আসি ২৩২ হিজরীতে। (অর্থাৎ এ সফরে ৫ বছর তিনি ইলম অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করেন)
এ সফরের সূচনা করি পবিত্র হজ্ব আদায়ের মাধ্যমে। এরপর হিজায ভূমি থেকে প্রথমে যাই মিশরে। সেখানে পনের মাস অবস্থান করি আমি। প্রথমে ইচ্ছা ছিল খুব বেশি দিন মিশরে থাকব না। তবে সেখানে ইলমের যেই আসর দেখেছি, জ্ঞান-প্রদীপদের যেভাবে আলো ছড়াতে দেখেছি তখন এই আলো বুকে ধারণ না করে আর যেতে মন চাইল না। প্রথমে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কিতাবসমূহ শোনার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু পরে ইলমের এ ঝর্ণা থেকেও ইলম শুধা পান করার আগ্রহ জেগে উঠল। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কিতাব সম্পর্কে ভালো জানা-শোনা আছে- প্রথমে এমন একজনকে খুঁজে বের করলাম। তার সাথে কথা হল, দিরহামের বিনিময়ে সবগুলো কিতাব সে আমাকে অনুলিপি

করে দেবে। তখন কাগজের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু কাগজ ছিল না আমার কাছে। মিশর থেকে দুই জোড়া কাপড় আমি কিনেছিলাম। ইচ্ছে ছিল বাড়ি গিয়ে তা সেলাই করে পড়ব। কিন্তু কাগজের কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় উপায়ান্তর না দেখে কাপড় জোড়া বিক্রি করে দেয়া হল। এরপর বিক্রিত মূল্যের কিছু অংশ দিয়ে কাগজ কেনা হল। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা, পৃ. ২৬১-২৬২)

কিতাবের প্রতি এ ভালবাসার জন্য তারাও এক একজন হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত কিতাব। তাদেরকে দেখেও অনুভব করা যেত কিতাবের সৌরভ। সে সৌরভ সুরভিত করত আলেম-তালিবুল ইলম সকলকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার মনেই কিতাবের প্রতি এমন ভালবাসা দান করুন- আমীন।

## ইলম অর্জনের জন্য নিয়ত বিশুদ্ধ করা

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে প্রধান বিষয়- নিয়ত বিশুদ্ধ করা
সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-
مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنّارَ النّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভূত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

## উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রহ. বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْهُ.

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

❒ উস্তায-শাগরিদের সম্পর্ক– একটি আদর্শ নমুনা :

**পাহাড়পুরী হুজুর (দা. বা.) এর বয়ান**

হুজুর বলেছেন, আমরা সবাই আখেরাতের মুসাফির। আমাদের পিছনে সর্বদা দুটি শত্রু লেগে আছে।

**এক.** অভ্যন্তরীন শত্রু নফস ও

**দুই.** বাহিরের শত্রু শয়তান।

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ

'নিঃসন্দেহে নফস মন্দ কাজের বেশি আদেশ করে থাকে'

-এটা নফসের স্বভাব। মুজাহাদার মাধ্যমে একে 'নফসে লাওয়ামা' বানানো এরপর তাকে 'নফসে মুতমাইন্নার' পর্যায়ে উন্নীত করা নাজাতের জন্য জরুরি।

নফসের ধোঁকায় যদি গুনাহ হয়ে যায় তবে ইস্তেগফার করতে থাকবে। খালেস অন্তরে তওবা করবে এবং নফসের বিরোধিতা অব্যাহত রাখবে।

মুজাহাদার জন্য যে বিষয়টি সহায়ক হবে তা হল *দাওয়ামে যিকির* ও *কাছরতে যিকির* অর্থাৎ সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ ও অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির। যিকরুল্লাহ স্বতন্ত্রভাবেও কাম্য আবার তা নফসের মুজাহাদার ক্ষেত্রে ওষুধও বটে। মৌখিক যিকির সর্বদা করা যায় না কিন্তু অন্তরের যিকির সর্বদা জারি রাখা যায়। আর মৌখিক যিকির সার্বক্ষণিক সম্ভব না হলেও অধিক পরিমাণে করা সম্ভব।

আকাবির যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং তাসাওউফের বিষয়াদি বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করেছেন। হুজুর যিকিরের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এক যরবী, দুই যরবী, তিন যরবী ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি বাতিয়েছেন। পরিভাষা বিশেষ জরুরি বিষয় নয় এবং শরীয়ত যদি কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট না করে থাকে তবে পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে পারে। তবে তোমরা যদি সাধ্যমত *কালেমায়ে তাওহীদ ও ইসমে যাত*-এর যিকির করতে থাক তাহলে নফসের সংশোধন ও চরিত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে এর অনেক সুফল দেখতে পাবে।

সারকথা আমাদের করণীয় হল,

১. মুজাহাদা, অর্থাৎ নফসের চাহিদা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করা।

২. গুনাহ হয়ে গেলে তওবা ইস্তেগফার দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা।

৩. আত্মিক ব্যাধিগুলোর চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

৪. দাওয়ামে যিকির (মুরাকাবা) ও অধিক পরিমাণে মৌখিক যিকিরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

(এ কাজটি তালিবে ইলমরা নিজ নিজ তা'লীমী মুরব্বীর পরামর্শক্রমে বিশেষ নিযামুল আওকাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে।)

মুরাকাবার একটি উদাহরণ হল, রাস্তা-ঘাটে চলতে গিয়ে বদনযরের অবস্থা সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতের কথা স্মরণ করা-

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْر

'অর্থাৎ আল্লাহ চোখসমূহের খিয়ানত ও অন্তরে লুকায়িত বিষয়গুলো সম্পর্কেও জানেন' এই চিন্তার সাহায্যে ইনশাআল্লাহ নযর হিফাজতে সাহায্য পাওয়া যাবে।

পাহাড়পুরী হুজুর বয়ান শেষে মজলিস থেকে যাওয়ার সময় মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ সাহেবকে অনুরোধ করেন, তিনিও যাতে সংক্ষিপ্ত বয়ান রাখেন। এ প্রসঙ্গে পাহাড়পুরী হুজুর বলেন,

দেখো, বিদ্যুতের সকল উপকরণ যদি বিদ্যমান থাকে, সবকিছু ঠিকঠাক মতো লাগানো আছে, লাইনে বিদ্যুতও আছে কিন্তু যতক্ষণ সুইচ টিপে বাতি ও পাখায় বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া না হবে ততক্ষণ বাতিও জ্বলবে না, পাখাও ঘুরবে না। তদ্রূপ ইলমের সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও **উস্তাদের সঙ্গে যদি তোমাদের সংযোগ মজবুত না হয় তবে তোমাদের ইলমে নূরও থাকবে না এবং ইলমে বরকতও হবে না।**

এই যুগে যদি উস্তাদের সঙ্গে সর্ম্পকের যথার্থ কোনো দৃষ্টান্ত তোমরা দেখতে চাও তাহলে এই মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ সাহেব আছেন তাকে দেখ। আল্লাহ তাআলা কবুল

করুন। এই কথাটিও দুআ হিসেবে বললাম, তা'রীফ হিসাবে নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

**মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ ছাহেব-এর বয়ান,**

পাহাড়পুরী হুজুর ইলমের সাথে সম্পর্কিত কিছু কথা বলার জন্য হুকুম করেছেন। কথা যুগ যুগ ধরে একই বলে আসা হচ্ছে। নতুন কোনো কথা নেই। দ্বীন যেহেতু নতুন নয়, ইলম যেহেতু নতুন নয়, তাই কথা একই কথা হবে। আলফাযের কিছু বেশ কম হয়। যামানার হালাতের কারণে কিছু বেশ কম হয়। কথা একই।

এবারের (যিলক্বদ সংখ্যা) আলকাউসারে একটা মজমুন প্রবন্ধ দেখেছি। আমার মনে হয় যে, প্রত্যেক তালিবুল ইলমের এই যামানায় এ মজমুনটা অন্তত 'উসবুয়ী' অর্থাৎ সাপ্তাহিক মোতালাআর বিষয় বানানো উচিত। এমনি তো ছড়ানো মজমুন অনেক থাকে, কিন্তু গোটানো মজমুন, গোছানো মজমুন খুব কম। বিশেষত তালিবুল ইলমদের লক্ষ করে যে মজমুনগুলো লেখা হয় ওই মজমুনগুলো সাধারণত গোছানো থাকে। ওই মজমুনগুলো 'لأئحه عمل' বানিয়ে নিলে খুব ফায়দা।

মজমুনটা তালিবুল ইলমদের ইলমের মহব্বত কীভাবে পয়দা হবে, ইলমের পিপাসা কীভাবে জাগ্রত হবে, এই বিষয়ে আমার কাছে মজমুনটা খুব যুগোপযোগী, সময়োপযোগী এবং পাত্র উপযোগী মনে হয়েছে। আমি নিজেও এটার উপর আমল করার চেষ্টা করব। আমরা সবাই এটার উপর আমল করার চেষ্টা করব।

এই যামানায়, হুজুর (পাহাড়পুরী হুজুর দামাত বারকাতুহুম) যে কথাটা বললেন খুব দামি দামি পাখা লাগানো হচ্ছে, দামি দামি বাতি লাগানো হচ্ছে কিন্তু আলোর জন্য যে সংযোগের প্রয়োজন সে সংযোগের চিন্তা করা হচ্ছে না। এখন আলহামদুলিল্লাহ তালিবুল ইলমরা খুব দামি দামি কিতাব সংগ্রহ করে থাকে এবং ইলমের জন্য অভিভাবকরা আগের তুলনায় বেশি ব্যয় করে থাকেন। মানে এই সব দিক থেকে ইযাফা হয়েছে। কিন্তু ইলম ও ইলমের নূর যে সংযোগের মাধ্যমে আসে সেই সংযোগটা আসলেই কমে গেছে।

আমার জন্য এটা খুব শোকরের বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি পাহাড়পুরী হুজুর যে বলেছেন উস্তাদদের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক রাখতে হয় তার নমুনা বর্তমানে দেখতে চাইলে আবু তাহের মিছবাহকে দেখ, এটা আমার জন্য সতর্কবাণী, আসলে যে পরিমাণ তাআল্লুক থাকা দরকার সেই পরিমাণ তাআল্লুক রাখতে পারিনি। মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব

আজকে একটা সুন্দর কথা বলেছেন, "ফানা ফিশশায়খ যেমন আধ্যাত্মিক জগতে কামিয়াবীর জন্য জরুরি তেমনি ইলমের জগতে ফানা ফিলউস্তাদ জরুরি"।
এই ইবারতটা আমি নতুন শুনেছি। আমার দিল খুব আনন্দের সাথে কথাটা কবুল করেছে। ইলমের জগতে ইলমের হদ তক কামিয়াবীর জন্য ফানা ফিল উস্তাদ, অর্থাৎ যখন যার থেকে আমি ইলম হাসিল করব তখন প্রতিটি বিষয়ে তার নেগরানী ও রহনুমায়ী কবুল করে মেহনত করব অন্তত যখন যার থেকে যে বিষয়টি আমি ইস্তেফাদা করি, যার কাছ থেকে যে বিষয়ের ইলম হাসিল করি, সমস্ত নেগরানী, তত্ত্বাবধান সবকিছু তার কাছ থেকেই গ্রহণ করি এবং তার ইজাযত ছাড়া এই ইলমটাকে কোনো কাজে ব্যয় না করি। এটাকে ব্যয় করতে হলেও তার ইজাযত নিয়ে ব্যয় করা উচিত। এটা শারাফাতের দাবি। এই যে মনে করেন আপনারা এখানে হাদীস পড়বেন কিংবা ফিকহের ইস্তেফাদা করবেন এ ক্ষেত্রেও একথাটি প্রযোজ্য। ফানা ফিলউস্তাদ হওয়ার এটাও একটা দাবি যে, পরবর্তীতে এটা আমি যখন ব্যবহার করব ব্যবহারটা যেন উস্তাদের মানশা মোতাবেক হয়। এটা যদি করতে পারি তাহলে ওই বিষয়ের যেটাকে রূহ বলে সেটা ইনশাআল্লাহ অর্জন করতে পারব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন।
মনে হয় হুজুরের আদেশ হিসাবে মোটামুটি যথেষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।
মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব বললেন, কিছু অভিজ্ঞতা শুনাবেন না? জীবন থেকে শিক্ষা? হুজুর বললেন, জীবন থেকে শিক্ষা একটা বিস্তৃত বিষয়। একজন আলেম যেমন তার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যকে দিতে পারে, একজন সাধারণ মানুষও তার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যকে দিতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্যেও উপকৃত হতে পারে। আমাদের তো ঘটনাই আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ডাকাতের কাছ থেকে সবক হাসিল করেছিলেন।
এ জন্য অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি একটু স্বতস্ফূর্তভাবে বলার হিম্মত করি। কারণ যে কেউ যে কাউকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে পারে। তালিবুল ইলম তার জীবনের অভিজ্ঞতা উস্তাদকে সরবরাহ করতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে উস্তাদও উপকৃত হতে পারে।
জীবনের অভিজ্ঞতা এমন জিনিস যে, ইলমের কমতি জীবনের অভিজ্ঞতা পূর্ণ করে দেয়। এটা ইলমের একটা প্রকার। তো আজকের এই পরিবেশের সাথে মুয়াফিক একটা অভিজ্ঞতার কথা উনি বলার সাথে সাথে আমার মনে পড়ে গেল।

আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র সময়, সময়ের অংশগুলোকে বেশ ভালো কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু আমরা তা করি না। অথচ দুনিয়ার ক্ষেত্রে মানুষ তার মেধা, তার যোগ্যতা, তার যাবতীয় সাধ্য ব্যয় করে তার সময়ের ভগ্নাংশগুলিকে হেফাজত করার জন্য। কাগজের টুকরা পড়ে থাকে, এই কাগজের টুকরাগুলো সংগ্রহ করে করে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে। ফেলে দেওয়া বোতল, প্লাস্টিকের এই টুকরাগুলিকে জোগাড় করে করে।

এগুলো কিন্তু মৌলিক কোনো উপাদান নয় এবং পণ্যসামগ্রী নয়, কিন্তু এইগুলিকে জোগাড় করে করে মানুষ একটা শিল্প গড়ে তুলছে। এসব হল অব্যবহৃত বর্জ্য, অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া জিনিস। এগুলিকে সংগ্রহ করে কাজে লাগাচ্ছে। এতে মানুষের জীবনে অনেক সাশ্রয় আসছে। অনেক ফায়দা হচ্ছে। আমাদের জীবনের সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকেও এভাবে কাজে লাগানো চাই।

কোনো কাজ করার ফাঁকে দুই মিনিট থাকে, তিন মিনিট থাকে, এমনকি অনেক সময় দশ পনের মিনিটও চলে যায় অন্য একটা কাজের অপেক্ষায়। এ কাজটা হয়ে গেলে আমরা ভাবি যে, যে জন্য এসেছিলাম কাজটা হয়ে গেছে। আসলে আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে সময়ের এই আজযাগুলিকে হেফাজত করতে পরা।

আল্লাহর সাথে যাদের সর্ম্পক তারা তো সময়ের হেফাজতের সবচেয়ে সুন্দর নুসখা বলেন যিকিরের কথা, ফিকিরের কথা। আমরা ইলমের ময়দানে যারা থাকার চেষ্টা করছি, আমরাও যদি সময়ের আজযাগুলিকে হেফাজত করি, কিছু কাজ নির্ধারিত করে রাখি, যখন বড় কাজ না থাকে, যখন দুই তিন মিনিট চার-পাঁচ মিনিটের একটা অবসর থাকে, তখন যদি এই কাজগুলি করি তাহলে সময়ের হেফাযত হবে।

এটা আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। আমি কয়েকদিন আগেও ছাত্রদেরকে বলেছি, সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশগুলোকে কীভাবে হেফাজত করা যায় এবং কিভাবে তা থেকে ইস্তেফাদা করা যায়। আমি একটা কিতাবের পুরা পরিকল্পনা তিন মিনিট, চার মিনিট পাঁচ মিনিট এগুলো হেফাযত করে করে তৈরি করেছি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে আমি একটা নোটবুক সাথে নিয়েছিলাম। যখনই দুই মিনিট, পাঁচ মিনিট অন্য কাজের অপেক্ষায় থাকি তখন আমি ওই কাজটি কীভাবে করব চিন্তা করতাম এবং নোট করে রাখতাম। পরে লিখতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, এই কিতাবটা লিখতে যত সময় ব্যয় হত তার চেয়ে অনেক কম সময়ে আমার কাজটা হয়ে গেছে। সময়ের আজযা হেফাজত করার আরও ছোট ছোট বিষয় হতে পারে।

ছোট রিসালা যদি সাথে রেখে দেই এটার মোতালাআ দুই তিন মিনিট করে করা যায়। বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমি এই কাজটা করতাম। বই সাথে নিয়ে নিতাম। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছি, দেখেছি যে, বিয়ে বাড়িতে যে সময়টা আমার কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ ছিল না কিন্তু আমার যেতে আর আসতে মাঝখানে-এই সময়ের মধ্যে পুরা একটা বই পড়া হয়ে গেছে।

সময়ের أجزاء গুলো হেফাজত করার জন্য আমরা একটু মুনাযযাম হই। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমাদের যিন্দেগীর সময়ের আজযাগুলি একত্র করলে জীবনের একটা বিরাট অংশ দেখা যায় এভাবে নষ্ট করেছি। অথচ সময় আমাদের এত কম, যিন্দেগীর তিন ভাগের একভাগ তো চলে যায় মূল কাজ ছাড়া। তো এই সময়ের ভগ্নাংশগুলোকে হেফাজত করার চেষ্টা করি।

এটার জন্য মোতালাআ করতে হলে ছোট্ট রেসালা রেখে দেই। নিয়মিত দুই তিন পৃষ্ঠা মোতালাআ করলাম, আরেক সুযোগে এক পৃষ্ঠা মোতালাআ করলাম। এভাবে একটা কিতাব যদি আমি তিন-চার বারে মোতালাআ করি তো দেখা যাবে যে, ওই কিতাবটা বসে একেবারে পড়ে যে ফায়দা হত এর চেয়ে বেশি ফায়দা হবে।

লেখার ক্ষেত্রেও এমন হতে পারে। আমরা সাহিত্য চর্চার কথা অনেকে বলি। সময় পাই না। যদি হালকা মজমুন, এমন কোনো বিষয় যা বাসের অপেক্ষায় থেকেও লেখা যায় বা কারও সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে থেকেও লেখা যায়, তাহলে ওই লেখাগুলো চলতে থাকলে দেখা যাবে এক বছরে লেখার যোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে। তো লেখার ক্ষেত্রেও আমরা সময়ের আজযাগুলি হেফাজত করতে পারি। পড়ার ক্ষেত্রেও সময়ের আজযাগুলি হেফাজত করতে পারি। আবার কোনো মজমুন, কোনো পরিকল্পনা বা কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রেও খুচরা সময়গুলি হেফাজত করতে পারি। ওই সময় যদি ফিকির করি, আর ফিকিরটা একটা কাগজে টুকে রাখি তাহলে দেখা যাবে, কয়েক দিনের মধ্যে আমার খাতায় অনেকগুলি চিন্তা জমা হয়ে গেছে। সেগুলো আমি একসাথে বসে বের করতে পারতাম না। এই চিন্তাগুলি পরে আমি কাজে লাগাতে পারি।

এটা আমার জীবনের একটা ভালো অভিজ্ঞতা। খুচরা সময়গুলি হেফাজত করার চেষ্টা করা এবং এটা থেকে লাভবান হওয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সেই কিতাব কোনটা? আদীব সাহেব হুজুর বললেন, এটা আমার 'الطريق الى العربية' -র সর্বশেষ

সংস্করণ, যার পরিকল্পনা আমি ফাঁকে ফাঁকে লিখে রাখতাম। এগুলি পরে যখন গ্রন্থরূপ দিতে গিয়েছি দেখেছি, অনেক অল্প সময়ে হয়ে গেছে। সর্বশেষ সংস্করণটা আগাগোড়া পরিবর্তিত। পুরো পরিকল্পনাটাই খুচরা সময়গুলোতে লিখে লিখে করেছি। এখন الطريق الى النحو সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছি। খেতে বসেও দেখি যে, খাবারের আয়োজনে পাঁচ মিনিট লেগে যায়। ওই সময় কোনো কিছু ফিকির করে কাগজে টুকে রাখা যায় কিংবা মোতালাআও করা যায়। প্রথম দিকে খুব অস্বস্তি লাগে বা হয়ে উঠতে চায় না। কিন্তু অভ্যাস হলে দেখা যায় যে আল্লাহ চাহে তো সময়ের একটা জুযও নষ্ট হয় না।
[সংকলনে: মাওলানা হাসিবুর রহমান
https://www.alkawsar.com/en/article/2997/ ]

**❒ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফি. বলেন:**
তালিবে ইলমের প্রতি উস্তাযের আস্থা কী কারণে নষ্ট হয়? বিভিন্ন কারণে।
**এক.** মিথ্যা বলার কারণে। মিথ্যা কথা যে কারো আস্থা নষ্ট করে দেয়। দু-চারটা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আস্থা শেষ।
**দুই.** বে-উসূলীর কারণে। তালিবে ইলম বে-উসূলী করতে থাকলে উস্তাযের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়।
**তিন.** উস্তাযের রাহবারী ও রাহনুমায়ী যে কবুল করে না তার প্রতি উস্তাযের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। এখানে থাকাবস্থায় এখন যে তালিবুল ইলম উস্তাযদের রাহনুমায়ী কবুল করে না সে সামনে গিয়ে কী করবে? তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আস্থা পয়দা হয় না উস্তাযদের দিলে। তাকে নিয়ে, তার ভবিষ্যত নিয়ে উস্তাযদের দিলে কোনো আশা ও কোনো তামান্না পয়দা হয় না।

পক্ষান্তরে যে মেহনত করে, মাদরাসার উসূল মেনে চলে এবং উস্তাযদের রাহনুমায়ী গ্রহণ করে তার প্রতি উস্তাযদের আস্থা হয়- ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা ভবিষ্যতে কাজ হবে। এর ব্যাপারে চিন্তা করা যায় যে, এর থেকে আমরা কী খেদমত নেব? উম্মতের কোন কাজে তাকে লাগাব? দ্বীনের কোন খেদমতে তাকে যুক্ত করব?

যে তালিবে ইলমের ভবিষ্যত নিয়ে উস্তায ভাবেন সে সাআদাতমান্দ তালিবে ইলম। একটা তো হল, সব তালিবে ইলমের ভবিষ্যত নিয়ে উস্তায ভাবেন। কারণ তাদের পেছনে

উস্তাযগণ মেহনত করেনই তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হওয়ার জন্য। এটার কথা বলছি না এখন। বরং সু্ুনির্দিষ্টভাবে কোনো তালিবে ইলমের সু্ুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত নিয়ে উস্তায ভাবেন- এটা তালিবে ইলমের জন্য সাআদাতের বিষয়। এই ভাবনা ওই তালিবে ইলমের জন্য আসে, যে উস্তাযের আস্থাভাজন।

সেটা কীভাবে হবে? বিভিন্নভাবে।

ক. সিদকের মাধ্যমে।

খ. আমানতের মাধ্যমে।

গ. উসূলের পাবন্দি করার মাধ্যমে। এগুলো উস্তাযের মনে আস্থা তৈরি করে।

উসূলের পাবন্দির একটি দিক হল, গায়রে হাযির না থাকা। সবসময় উপস্থিত থাকা। হযরত মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম কখনো সবকে গায়রে হাযির ছিলেন না। লালবাগে পড়াকালীন একবার এক উস্তাযের নিকট ছুটি নিচ্ছিলেন। ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু ডাক্তার দেখালে একটা সবক ছুটে যাবে। অথচ না দেখিয়ে উপায় নেই। বিশেষ জরুরত। অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি উস্তাযকে গিয়ে বললেন, ডাক্তার দেখানোর জরুরত। তখন উস্তায তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার তো সবকে গর হাযিরী নেই; আচ্ছা ঠিক আছে। এটা তো আগের দিনের ঘটনা।

পরের দিন উস্তায ওই দরসে আসেননি। তাঁকে ছুটি দিয়েছেন জরুরতের কারণে আর এদিকে তিনি দরসে আসেননি। ভেবেছেন, দরসে আসলে বেচারার সবক ছুটে যাবে অথচ ইতিপূর্বে সে সবকে কখনো অনুপস্থিত থাকেনি। আজকে ওজরের কারণে তাকে যেতে হচ্ছে; সুতরাং আজকে দরস না হোক।

এই হল তালিবে ইলম। তিনি তাঁর জরুরতে ছুটি চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি উস্তাযের এত আস্থা যে, তাঁর অনুপস্থিতিটা যাতে না হয় সেজন্য উস্তায সেদিন দরস করাননি। এর নাম তালিবে ইলম।

আজকালের তালিবে ইলমরা তো উস্তাযের মহব্বত চায়ও না। সাধারণত আমরা যা দেখি, আমভাবে তালিবে ইলমরা উস্তাযের মহব্বত চায়ও না-والله أعلم ।

নামের মহব্বত চায়; কিন্তু আসলে মহব্বত যেটাকে বলে, সেটা খুব কম তালিবে ইলম চায়। উস্তাযের কাছে মহব্বত চাইতে হয় না। উস্তায তো নিজের মহব্বত দিতে এবং ছাত্রের মহব্বত নিতে প্রস্তুত। শফীক ও দরদওয়ালা উস্তায তো এমনই হন। কিন্তু হতে

হবে তোমাকে। সেরকম পাত্র তো লাগবে। উস্তাযরা তো টেনে নেন। তুমি এমন হওয়ার চেষ্টা কর, তোমাকে বলতে হবে না, উস্তায নিজেই তোমাকে টেনে নেবেন।

ঘ. ইনহিমাক ও ফানা ফিল ইলম। উস্তায যার মধ্যে ফানা ফিল ইলম দেখবেন তার প্রতি উস্তাযের এমনিই মহব্বত হবে।

আমি মারকাযুদ দাওয়াহয় এমন হালত দেখেছি- কোনো মেহমান এসেছেন; একটু খেদমত দরকার। দারুল মুতালাআয় গিয়ে দেখি সবাই ইনহিমাকের সঙ্গে মুতালাআ করছে। আমি কাউকে ডাকিনি। খেদমত দরকার, আসা দরকার এ কথা কাউকে বলিনি। অন্যভাবে ওই জরুরত সেরেছি। এরকম দৃশ্য একবার আমিও দেখেছি মারকাযুদ দাওয়াহয়। সেটা পাওয়া যায় না সবসময়। শায-নাদের পাওয়া যায়। ওই ইনহিমাক যদি কোনো উস্তায দেখেন, তার মন তো এমনিতেই বাগবাগ হয়ে যাবে খুশিতে। আমি বলিনি তাদেরকে, ওঠো, আসো, কাজ করো। মনে হয়েছে, আমি কীভাবে একজন তালিবে ইলমকে ইনহিমাক ছাড়তে বলব?

হযরত মাওলানা সাহবান মাহমুদ ছাহেব রাহ. বলতেন, আরে! তোমরা তো অনেকসময় নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটো। অথচ আমি কারো মুনাজাতের সামনে দিয়ে হাঁটতে চাই না। একজন মুনাজাতে মুনহামিক। আমি তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাব; তার মুনাজাতের ইনহিমাকে ক্ষতি হবে- এটা আমি চাই না। তিনি তাঁর যওক ও জযবার কথা বলেছেন। এটা কোনো মাসআলা নয়; মুনাজাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয আছে। কিন্তু কেউ ইহতিয়াত করলে গুনাহও নেই।

ইনহিমাকের বড় কদর। ইনহিমাক কাকে বলে? মুদাওয়ামাতের সঙ্গে ইলমের তলবে ও ইলমের পথ চলায় নিমগ্ন থাকা এবং ইলমের পথে প্রতিবন্ধক এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা। একে বলে ইনহিমাক।

ইনহিমাকের সিফাত, একাগ্রতার সিফাত এবং খলওয়াতের সিফাত- এগুলো অত্যন্ত জরুরি। ইলমের জন্য আমি খালি, আমি ফারেগ। ইলম ও ইলম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে আমার কোনো শোগল নেই। এর বাইরের জিনিসগুলোকে আমি আপদ মনে করি।

لكل شيء آفة،و للعلم آفات.

সেগুলোকে আমি আপদ মনে করি। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই- আল্লাহ! آفات العلم থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

যাহোক ইনহিমাক তালিবে ইলমের জন্য উসতাযের মনে মহব্বত, কাশিশ ও আস্থা তৈরি করে। এটা মূলত সিদকের অংশ। আমি তালিবে ইলম। আমার তলবটা সাদিক হতে হবে। আমি যদি সাদিক ও আমীন তালিবে ইলম হই, আমার মুনহামিক না হয়ে কোনো উপায় নেই। ওর মধ্যেই বিষয়টা আছে। কিন্তু সিদক ও আমানত বললে তো এত কিছু যেহেনে আসে না; সেজন্য ভিন্ন করে বললাম।

ঙ. আদব।

চ. তাওয়াযু। এগুলোর দ্বারাও তালিবে ইলমের প্রতি উস্তাযের দিলে আস্থা তৈরি হয়। কোনো না কোনো কাশিশ তো তোমার মধ্যে থাকতে হবে। মারগূব ফীহ হওয়ার জন্য কোনো না কোনো দিক থেকে তোমার মধ্যে কাশিশ থাকতে হবে। বরং কাশিশের একাধিক কারণ নিজের মধ্যে থাকতে হবে।

কাশিশের কারণ তো নেই; উল্টো দূরত্বের কারণ আছে আমার মধ্যে। উস্তায ও শাগরিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে এরকম অনেক কারণ আছে আমার মধ্যে। তাহলে কীভাবে উস্তাযের সঙ্গে আমার মহব্বত হবে?

দূরত্ব তৈরি করে যেসব জিনিস সেগুলোরও তালিকা আছে। ইতিপূর্বে কয়েকটি উল্লেখ করেছি। ওগুলো থেকে বাঁচতে হবে। কাশিশের কারণ যেগুলো বললাম সেগুলোর বিপরীতগুলোই দূরত্বের কারণ। সিদকের অভাব, আমানতের অভাব, উসূলের পাবন্দির অভাব, ইনহিমাক ফিল ইলমের অভাব- এগুলো দূরত্ব তৈরি করে। আদবের বিপরীতে সূয়ে আদব এবং তাওয়াযুর বিপরীতে উজব ও কিবর- এগুলো দূরত্ব তৈরি করে। উস্তায যা চান এবং উস্তায আমাকে নিয়ে যা আশা করেন সেটার প্রতি আমার কোনো তাওয়াজ্জুহ নেই; এর দ্বারা দূরত্ব তৈরি হবে কি না? অবশ্যই।

অতএব উস্তাযদের দিলে আমাদের প্রতি কাশিশ ও আস্থা তৈরি করে- এমন সিফাত আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমাদের সবাইকে কবুল করুন- আমীন।

## ইলমের ক্ষেত্রে ‘কানাআত’ বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের ‘কানাআত’ বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে

হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী।

-মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

**❒ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী(রহ.) এক মজলিশে বলেছেন-**

“শেষ কথা হল, নিজেকে ইলম অন্বেষণে নিমগ্ন রাখুন। নিজেকে কখনো ‘ফারেগুত তাহসীল’ মনে করবেন না। আপনি যেখানেই থাকুন হাতের কাছে থাকা পুরনো কিতাবাদি কিংবা নতুন ছাপা কিতাবাদি পড়তে থাকবেন, কুরআন মাজীদের তাফসীর গ্রন্থ, হাদীসের শারহ ও ভাষ্যগ্রন্থ, তারিখ ও ইতিহাস গ্রন্থাবলি পড়বেন। ইলমে কালাম সম্পর্কে লিখিত যে কিতাবগুলো সহীহ আকীদার উপস্থাপনের লক্ষ্যে সঠিক পন্থায় লেখা হয়েছে সেগুলোও পড়া যেতে পারে। এই গ্রন্থাবলির সাথে যেন আপনার সম্পর্ক থাকে। আপনি সর্বাবস্থায় এগুলো মুতালাআয় রাখবেন এবং নিজের মারকাযের সাথে সবসময় সম্পর্ক কায়েম রাখবেন-

پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ .

(মর্ম :) হে বৃক্ষশাখা! নিজেকে বৃক্ষের সঙ্গে যুক্ত রাখো, আগত বসন্তের আগমনে বৃক্ষের সঙ্গে তুমিও সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। মনে রেখো, বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখায় বসন্তের আগমনে প্রাণের সঞ্চার ঘটে না। -ইকবাল, বাঙ্গে দারা

[সূত্র : তা‘মীরে হায়াত, লক্ষ্ণৌ, ২৫ মার্চ ১৯৮৮ ঈ.
***ভাষান্তর :* মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ]**

## লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।
-সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮
আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?! -মাসিক আলকাউসার :সংখ্যা ৯

## নারী-সমাজের তলবে ইলমের প্রয়োজন

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين؟ قال : واثنين.

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

নারীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, পুরুষেরা আপনার বিষয়ে আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়াছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে একটি দিন নির্ধারণ করুন। তখন তিনি তাহাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করিলেন এবং ওই দিন তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন এবং আদেশ দিলেন। তিনি তাহাদিগকে যাহা কিছু বলিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা এই, তোমাদের যে কোন মহিলা, তিনটি সন্তান অগ্রবর্তী করিবে, তাহা তাহার জন্য জাহান্নাম হইতে আড়াল হইবে। জনৈকা স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল, দুইটি? তিনি বলিলেন, দুইটিও।
(বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস : ১০১)

**ফায়দা :** এইরূপ অন্য ঘটনায় আবূ হুরায়রা রা. হইতে বর্ণিত আছে-
فقال موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن.
তিনি বলিলেন ‘তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান হইল অমুক স্ত্রীলোকের বাড়ী। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট গেলেন এবং আলোচনা করিলেন।’

এই হাদীস হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় নারী-সমাজের মধ্যে ইলমের কী পরিমাণ তলব ছিল। উম্মাহাতুল মুমিনীনের মাধ্যমে তো তাহারা ইলম হাছিল করিতেনই, এমনকি মসজিদের দরজায় আসিয়া হযরত বিলাল রা.-এর মাধ্যমে প্রশ্নও পাঠাইতেন, এমনকি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উদ্যোগেও নারীগণকে একত্র করিয়া উপদেশ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন।
কিন্তু তাহাদের ইলমের তলব ও পিপাসা তাহাতেও নিবারিত হয় নাই। তাহারা অধিক ইলম হাছিল করিবার জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আবদার করিয়াছেন, যেন তিনি তাহাদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করিয়া দেন, যখন শুধু তাহারা প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা করিবেন।
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সানন্দে তাহাদের অনুযোগ ও আবদার গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত ইহাতে বর্তমান যুগের নারী-পুরুষ সকলেরই জন্য শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় রহিয়াছে।

সন্তানের মৃত্যু মাতৃহৃদয়ের জন্য কত যে কঠিন শোক ও যন্ত্রণার কারণ তাহা রহমতের নবী ছাড়া আর কে বুঝিবে? তাই তো তিনি এই ভাবে সান্ত্বনা দিতে পারিয়াছেন। হযরত

আনাস রা.-এর আম্মা উম্মে সুলায়ম রা. এবং আরও কতিপয় আনসারী নারী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দুইটি সন্তানের মৃত্যুতে সবর করিলে কী হইবে? অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উম্মে আয়মান রা. একটি সন্তান সম্পর্কেও প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একটি সন্তানের মৃত্যুতেও একই আজর পাওয়া যাইবে।
আমাদের কত মা সন্তানশোকে অসঙ্গত বিলাপ করে, কিন্তু এই হাদীছটি তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়ারও যেন কেহ নাই।
[হাদীসের আলো জীবনের পাথেয়: ৫৬-৫৭]
★এক মহিয়সী নারীর গল্প বলি, যার সবর এবং চেষ্টার সামনে বারংবার এসেছে পাহাড়সম উঁচু সব বাধা কিন্তু তার চাওয়া এবং তার মুনাজাত কবুল করে আল্লাহ তাকে অতিক্রম করিয়েছেন সকল বিপত্তি, তাকে আলোকিত করেছেন এক সূর্যসন্তানের মাধ্যমে, জানতে ইচ্ছা হয়? এই মহিয়সী নারী কে বা কি তার পরিচয়?

আপাতত তার কুনিয়াত জানাচ্ছি কেবল আপনাদের সামনে নাহয় নামটা পরে জানলাম, এই মহিয়সী নারীর কুনিয়াত ‘উম্মু আব্দিল্লাহ’।

ঘরদোর তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাচ্ছিনা কিতাবগুলো এটা নিশ্চয়ই তারই কাজ, আজকেও কোথাও নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে কিতাবাদী। ডাকো তো কোথায় সে?

এভাবেই বড় ভাইবোন তলব করেতো উম্মু আব্দিল্লাহর, তার একটা দোষ প্রকাণ্ড সেটা হচ্ছে সে বইপ্রেমী প্রচুর পড়তে চায়, পড়ার নেশা এতো তীব্র যে বড় ভাইবোনের কিতাবাদী নিয়ে গাছের কোটরে মাঝে মাঝে চৌকি বা চুলার নিচে নিয়ে লুকিয়ে রাখে, ধরা পড়লে মারও খায় কিন্তু উম্মু আব্দিল্লাহ তার কাজ থেকে সরে না, যার কিতাবের প্রতি ভালোবাসা তীব্র সে কি আর চাইলেই সরে আসতে পারে? উম্মু আব্দিল্লাহও পারেনা। কিন্তু সমস্যা একটাই উম্মু আব্দিল্লাহ আসলে সেভাবে পড়ার সুযোগই পায়নি।

উম্মু আব্দিল্লাহর মা ছিলো সেবেলায় খুবই অসুস্থ, সেজন্য মা ফুসরৎ পায়নি মেয়েকে পড়ানোর, বড় ভাইবোন পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকার সুযোগ পেলেও উম্মু আব্দিল্লাহকে ঘরোয়া কাজে সাহায্য করতে হতো, কাঁদতো খুব পড়ার জন্য।

নানাবাড়িতে গেলে বড় বড় কিতাবের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিতাব দেখতো, টেবিলের উপরে রাখা কিতাবের পাতা উল্টাতো কিন্তু বুঝতোনা কিছুই। মামারা ছিলেন আলিম উলামা তারাও দেখতেন, এসে বলতেন কিতাব ধরে নষ্ট করোনা তোমার মা অসুস্থ এখন, সুস্থ হোক তখন পড়া শিখে পরে পড়ো, এটা শুনে উম্মু আব্দিল্লাহ আরো কাঁদতো।

পড়াশোনা তার জন্য ছিলো আমাবশ্যার চাঁদের মতোই, তার চোখভেজা মুনাজাতগুলো শুনতো কেবল একজনই, যিনি আরশের অধিপতি। তিনিই উম্মু আব্দিল্লাহর বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন চেষ্টার ফুলকি, তাইতো উম্মু আব্দিল্লাহ চেষ্টা কোনদিনই ছাড়েনি।

মধ্যরাতে হারিকেনের চারপাশে কাপড় পেঁচিয়ে তিনি লিখতেন যেন আলো বেশি দূরে না যায় কারো শব্দ পেলেই আলো নিভিয়ে দিতেন। তার মেধা এতোটাই প্রখর ছিলো যে ভাইদের পড়া কেবল শুনে শুনেই তিনি আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন।

নিজের আত্মজীবনীতে তিনি জানান যে নিজস্ব চেষ্টায় পড়তে পড়তে একসময় নাহু-সরফের পুরো কিতাবই তিনি মুখস্থ করে ফেলেন, আরবি শব্দের বিশাল ভাণ্ডারে তিনি মহারথ হাসিল করেন। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত সকল কিতাব তিনি একাই পড়ে শেষ করে ফেলেন।

এরপর তিনি ঠাঁওর করেন যে কুরআন মাজীদ হিফজ করবেন কিন্তু বাসায় যে বেশি কুরআনের কপিও নেই, বাবা মায়ের মুসহাফ ছাড়া আর একটাই কুরআন ছিলো কিন্তু সেটা তো বেশ পুরোনো পেইজও ছিঁড়া, কিন্তু হিফজ যে করতেই হবে। পৃষ্ঠাগুলো একত্রিত করে লুকিয়ে লুকিয়ে হিফজও পড়া শুরু করেন উম্মু আব্দিল্লাহ।

তার সবক, সাতসবক বা আমুখতা এবং সবীনা সব একজই শুনতেন সেটা আল্লাহ। এভাবে পড়তে পড়তে একসময় তিনি পূর্ণ হাফিজাও বনে যান। তার কলব নূরান্বিত হয়ে ওঠে।

কি মনে হচ্ছে নিছকই গল্প এটা? এখনো কিন্তু এই মহিয়সী নারী জীবিত অশীতিপর এই বৃদ্ধা এখনো কুরআনের সবক দিয়ে থাকেন, জানেন ইনি কে? ইনি কার মা?

ইনি উপমহাদেশের শান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস ও উচ্চতর গবেষণার **অন্যতম মহামনিষী বাংলাদেশের শাইখ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহর মা।**

আমি বারংবার বলি সেই সন্তানই শ্রেষ্ঠ যার মা শ্রেষ্ঠ। সন্তানকে সর্বোত্তম হতে হলে মায়ের সর্বোত্তম হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই, তাই আমি মায়েদের উদ্দেশ্যে বলি যে আমলে, আখলাকে, বিচক্ষণতায় এবং তাকওয়ায় আপনি কেমন মা তার প্রভাব আপনি আপনার সন্তানের উপরও পাবেন যদি সেভাবে তাকে লালন করেন।

আল্লাহ এই মহিয়সী নারীর হায়াতকে আরো দীর্ঘায়িত করুন। আপনারা কি জানতে চান উনার নাম কি? উনার নাম সেটাই যেটা সায়্যিদাতুল জান্নাহ এর নাম। হ্যাঁ উনিও ফাতিমা। মাসিক নিয়ামতে একাধিক পর্বে এই মহিয়সীর জীবনকাহিনী প্রকাশ পেয়েছে যা আপনারা সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। এমন মায়েরাই আমাদের নারীদের জন্য প্রকৃত আদর্শ, আমি চাই আপনারা তাই এমন মায়েদের গল্প ছড়িয়ে দিন সবার মাঝে, উনাকে দেখে যদি একজন মানুষও বদলায় তবুও আমরা কামিয়াবির দিকে আরো একধাপ এগুতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

{ একজন সহপাঠী থেকে সংগৃহীত }

❒ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে নারীর জিজ্ঞাসা ও নারীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা

অজ্ঞতাই হল মানুষের মূল অবস্থা, মানব শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। এরপর ধীরে ধীরে সে শেখে। কৌতুহলী হয় এবং উত্তর খোঁজে। একসময় সে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তো অজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞতায় পৌঁছার প্রধান সূত্র জিজ্ঞাসা।
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'অজ্ঞতা-ব্যধির উপশম হল জিজ্ঞাসা।'

দ্বীনের বিষয় সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বিশিষ্টতা ও অগ্রগামিতার প্রধান কারণ ছিল আল্লাহর নবীর সোহবত ও সাহচর্য। তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং জবাব নিয়েছেন, সমস্যা পেশ করেছেন এবং সমাধান নিয়েছেন।

আর এ বিষয়ে নারীরাও পিছিয়ে ছিলেন না।

ঈমান-আকাইদ, তাফসীরুল কুরআন, তাফসীরুল হাদীস, ইবাদত-বন্দেগী, দাম্পত্য ও সামাজিকতা, কারবার ও লেনদেন, আদব ও শিষ্টাচার, আখলাক ও নৈতিকতা, পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গে তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়েছেন।

পারিভাষিক শব্দে বললে এই জিজ্ঞাসা ও জবাবের একটি বড় অংশ ছিল 'ইসতিফতা' ও 'ইফতা' তথা শরীয়তের বিধান জানার জন্য প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরে শরীয়তের বিধান বর্ণনা। আর যে বিধানটি বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় ফতোয়া।

সুতরাং নারীরা আল্লাহর নবীর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছেন এবং স্বয়ং আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফতোয়া প্রদান করেছেন। এর দ্বারা শুধু নারীদের অধিকারই সংরক্ষিত হয়নি, তাঁরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তাকওয়া ও দ্বীনদারির অধিকারী হয়েছেন।

ইসলামের সোনালী যুগের এই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা। হাদীসের কিতাব থেকে এখানে শুধু ঐসব জিজ্ঞাসাই তুলে ধরা হয়েছে যেগুলো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করেছেন নারী সাহাবীরা কিংবা যা করা হয়েছে নারীদের সম্পর্কে। প্রশ্নের বৈচিত্র থেকে যেমন ফতোয়ার বিষয়বস্তু ও তার বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি ইতিহাসের এই সত্যও অনুমান করা যাবে যে, ইলমে দ্বীনের চর্চা ও বিস্তার এবং দ্বীনের অনুসরণ ও প্রচারের উজ্জ্বল ইতিহাসে আমাদের পূর্বসূরী নারীদের অবদান ও অংশগ্রহণ মোটেই অনুজ্জ্বল ছিল না।

আজকের যুগের মুসলিম নারী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য এতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা অনুসরণ করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য অপরিহার্য, নিজেদের দ্বীনী ও ঈমানী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

## কাফির কি জনসেবার দ্বারা আখিরাতে মুক্তি পাবে

১. হযরত উম্মে সালামা রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চাচা হিশাম ইবনুল মুগীরা মেহমানদারি করতেন, আত্মীয়তা বজায় রাখতেন এবং আরো অনেক ভালো কাজ করতেন। আপনার যামানা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাঁর (হয়তো) ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হত। তাঁর ঐসব ভালো কাজ কি (আখিরাতে) কোনো উপকারে আসবে? রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তো দান করত খ্যাতির জন্য। সে তো কোনো দিন বলেনি, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাকে ক্ষমা করে দিও। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩১৬)

২. হযরত সালামা ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, 'আমি, আমার আব্বা ও আমার ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমরা দুই ভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের আম্মা মুলাইকা ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মারা গেছেন। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন স্বজনের হক আদায় করতেন, মেহমানদারি করতেন, আরো অনেক ভালো কাজ করতেন। এগুলো কি তাকে উপকৃত করবে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না।' তখন আমরা বললাম, তিনি তার এক বোনকে জীবন্ত কবর দিয়েছেন? এটি কি তার উপকারে আসবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ঐ যুগে) যে জীবন্ত কবর দিয়েছে এবং যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে উভয়ের ঠিকানা জাহান্নাম। তবে যে কবর দিয়েছে (যেহেতু সে বেঁচে ছিল তাই) সে ইসলামের যমানা পেলে এবং ইসলাম) গ্রহণ করলে (মুসলমান হওয়ার কারণে) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩১৭)

**ফায়েদা :** আপন বোনকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কারণে আখিরাতে মুক্তি হবে কি না-এ প্রশ্ন সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, আগের উত্তর থেকে তারা বুঝতে পেরেছেন, কুফর অনেক বড় অপরাধ এবং কাফির অনেক বড় অপরাধী। তো এত বড় অপরাধীকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে কোনো পুরস্কারের আশা আছে কি না-এ প্রশ্ন সম্ভবত তাদের মনে উদয় হয়েছিল।  তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুক্তির একমাত্র উপায় ঈমান, যদি এটা নসীব হয় তাহলেই শুধু আখিরাতে মুক্তির আশা করা যায়।

## ঈমানদার নারী

হযরত মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রা. তাঁর এক দাসীকে চড় মেরেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরে তাকে তাম্বীহ করলেন। ফলে তিনি অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'আমি কি তাকে আযাদ করে দিব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।’ মুআবিয়া রা. দাসীটিকে নিয়ে এলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আল্লাহ কোথায়?’ সে বলল, ‘আসমানে।’ তিনি বললেন, ‘আমি কে?’ সে বলল, ‘আপনি আল্লাহর রাসূল।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআবিয়া রা.কে বললেন, ‘তুমি একে আযাদ করে দাও। কারণ সে ঈমানদার।’ (সুনানে আবু দাউদ ১/১৩৪)

## যে নারীর দুই সন্তান মারা যায়

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে নসীহত করে বললেন, ‘যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় আখিরাতে তারা হবে মায়ের জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।’ একজন নারী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দুটি সন্তান মারা গেলে?’ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (দুটি সন্তান মারা গেলেও) সে এই প্রতিদিন পাবে।’ (সহীহ বুখারী ১/১৬৭)

## মহিলাদের গুনাহের কাফফারা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের উদ্দেশ করে বলেছেন, ‘হে নারীরা! তোমরা দান-সদকা কর। কারণ আমি অধিকাংশ জাহান্নামি দেখেছি তোমাদের নারীদেরকে।’

তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে (অধিকাংশ জাহান্নামি হবে নারী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ কর এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সহীহ বুখারী ১/৪৪)

## তাফসীর-প্রসঙ্গ

১. হযরত হাফছা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ‘আমি আশা করি, বদরের যুদ্ধে ও হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যারা উপস্থিত ছিল ইনশাআল্লাহ তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না।’ আমি আরজ করলাম, ‘আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

وان منكم الا واردها

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি আল্লাহকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে,

ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

(মুসনাদে আহমদ ৬/২৮৫)

**ফায়েদা :** এই হাদীস থেকে উম্মুল মুমিনীনের কুরআনী ইলম সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কারণ একে তো তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটি করেছেন আর প্রশ্নটিও ছিল একটি ‘ইলমী সুয়াল’ বা শাস্ত্রীয় প্রশ্ন। তাঁর প্রশ্নের কারণে দু’টো আয়াতেরই ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে পাওয়া গেল।

২. বিখ্যাত তাবেয়ী মাসরূক রাহ.-এর এক প্রশ্নের উত্তরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বাণী

ولقد رآه بالافق المبين

(তিনি তাকে দেখেছেন প্রকাশ্যে দিগন্তে)

ولقد رآه نزلة اخرى

(তিনি তাকে আরো একবার দেখেছেন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি (যে, তিনি আসলে কাকে দেখেছেন।) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তিনি তো ছিলেন জিবরীল আ.। তাঁর আসল আকৃতিতে মাত্র দু’বার তাঁকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি আসমান থেকে যমীনে অবতরণ করছিলেন। তাঁর বিশাল দেহ আসমান-যমীনের মাঝের স্থান ঢেকে ফেলেছিল।’ (মুসনাদে আহমদ ৬/২৫৯, হাদীস : ২৫৯১৭)

৩. হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলার বাণী

وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله

তোমরা তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ সেসব সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নিবেন।

من يعمل سوء يجز به

(যে ব্যক্তি কোনোরূপ মন্দ কাজ করবে তাকে এর শাস্তি দেওয়া হবে।) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেনি। এরপর তিনি বলেন, (দ্বিতীয় আয়াত সম্পর্কে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাকে জ্বর ও রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত করে এবং বিপদাপদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাম্বীহ করেন। এমনকি কোনো কিছু জামার আস্তীনে রেখে ভুলে যাওয়া এবং এ কারণে পেরেশান হওয়া, এটাও ঐ তাম্বীহের অন্তর্ভুক্ত। (এসব ছোটখাটো শাস্তির) ফলে বান্দা গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয় যেভাবে কামারের হাপর থেকে লাল লোহা জংমুক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। (জামে তিরমিযী ২/১২৩)

৪. ইবনে আবী মুলাইকা রাহ. বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর বৈশিষ্ট্য ছিল, কোনো কথায় তাঁর প্রশ্ন হলে জিজ্ঞাসা করতেন এবং ভালোভাবে বুঝে নিতেন। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন যে, 'কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে তার শাস্তি অবধারিত।'
তখন আয়েশা রা. আরজ করলেন, 'আল্লাহ তাআলা কি বলেননি-

فسوف يحاسب حسابا يسيرا

'অচিরেই তার সহজ হিসাব নেওয়া হবে।'
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই হিসাব তো শুধু জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই যার কাছে হিসাব চাওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে।' (সহীহ বুখারী ১/২১)

**ফায়েদা :** আল্লাহ তাআলা যে বান্দার প্রতি প্রসন্ন থাকবেন তার হিসাব হবে অতি সহজ, প্রকৃতপক্ষে তা হিসাব নয়, শুধু জানিয়ে দেওয়া যে, বান্দা! এই এই কাজ তুমি করেছিলে। একেই কুরআন মজীদে 'হিসাব' বলা হয়েছে। আর এজন্যই উম্মুল মুমিনীনের প্রশ্ন হয়েছে এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে যেমন আয়াতের অর্থ বোঝা গেল তেমনি হিসাব-কিতাবের ভয়াবহতাও জানা গেল।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম-

والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة

এখানে কি ওইসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা মদ পান করে এবং চুরি করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না হে সিদ্দীক কন্যা। তারা ঐসব লোক, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-সদকা করে আর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদের আমল (আল্লাহর দরবারে) কবুল হবে কি না? (সুনানে তিরমিযী ২/২৪৭)

## কুরআন মজীদে নারীদের কথা

হযরত উম্মে সালামা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ তাআলাকে (কুরআনে) নারীদের হিজরত সম্পর্কে কিছু বলতে শুনিনি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى

(জামে তিরমিযী ২/১২৭)

অন্য হাদীসে আছে, হযরত উম্মে উমারা রা. আরজ করলেন, আল্লাহর রাসূল! আমি তো সব কিছু শুধু পুরুষদের জন্যই দেখতে পাচ্ছি, নারীদের সম্পর্কে তো কিছুই বলা হচ্ছে না! তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

ان المسلمين والمسلمات ...

-জামে তিরমিযী ২/১৫২)

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/441/ ]

## আদব ও আখলাক প্রসঙ্গ

জালিমের জবাব কীভাবে দিবে?

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার কিছু ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল এবং সালাম দেওয়ার ছলে বলল, ‘আসসামু আলাইকা’ (অর্থাৎ আপনার উপর মৃত্যু নেমে আসুক)।

হযরত আয়েশা রা. তা বুঝতে পেরে জবাবে বললেন, ‘আলাইকুমুস সামু ওয়াল লা’নাতু’ (রবং মরণ ও অভিশাপ তোমাদের উপর পড়ুক।)

তাঁর এ কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

مَهْلاً يا عائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِيْ الْأَمْرِ كُلِّهِ

‘হে আয়েশা! সংযত হও। আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন।’

উম্মুল মুমিনীন আরজ করলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি শোনেননি তারা কী বলল?’

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমিও তো এর জবাব দিয়েছি। বলেছি, ‘ওয়া আলাইকুম’ (তোমাদের উপরও তা পড়ুক)।’-সহীহ বুখারী ২/৮৯০

**ফায়েদা :** রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাব ও উম্মুল মুমিনীনের জবাব প্রায় এক। তবে উম্মুল মুমিনীন উত্তেজনার ভাষায় জবাব দিয়েছেন এবং মরণ ও অভিশাপ কথা দু'টি উচ্চারণ করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তভাবে জবাব দিয়েছেন এবং ‘মরণ’ কথাটা উহ্য রেখেছেন।
এই হাদীসে দায়ী ইলাল্লাহগণের জন্য রয়েছে অনেক বড় শিক্ষা।

## মন্দলোকের সাথে কি সৌজন্য রক্ষা করা যায়

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। লোকটিকে (দূর থেকে) দেখে তিনি বললেন, ‘গোত্রের সবচেয়ে মন্দ লোক!’ কিন্তু সে যখন ঘরে এল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে হাসিমুখে কথা বললেন।
তার বিদায় নেওয়ার পর উম্মুল মুমিনীন প্রশ্ন করলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো প্রথমে তাঁর সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন, অথচ সাক্ষাতে হাসিমুখে কথা বললেন!’
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
متى عاهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.

আয়েশা! তুমি কি কখনো (কারো সাথে) আমাকে মন্দ ও অশালীন আচরণ করতে দেখেছ? কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যাকে মানুষ ত্যাগ করেছে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।-সহীহ বুখারী ২/৮৯১

**ফায়েদা :** এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম ও আচরণ সম্পর্কে জানা এবং তার তাৎপর্য বেঝার চেষ্টা করা কাম্য। আরো জানা গেল যে, সবার সাথে ভদ্র ও শালীন আচরণ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্বভাবের অংশ।

এজন্য আদর্শের বিষয়ে অটল থাকার পাশাপাশি একজন মুসলিমকে সর্বাবস্থায় ভদ্র ও শালীন আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

## যা নিজের জন্য পছন্দ করি না তা কি অন্যকে দান করতে পারি

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে 'দব' (মরুভূমির গিরগিটি জাতীয় একটি প্রাণী) রান্না করে পেশ করা হল। তিনি তা খেলেন না, কাউকে খেতে নিষেধও করলেন না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তা মিসকীনদেরকে খাওয়াতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন-

لا تطعموهم مما لا تأكلون

তোমরা নিজেরা যা খাও না তা গরীবদেরকে খাওয়াবে না।

-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৪৬১৭

**ফায়েদা :** উদারতা ও দানশীলতার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই হাদীসে রয়েছে। অনেক স্বচ্ছল মানুষও গরীব-মিসকীনকে দান করার সময় সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটা দান করে থাকে। যে খাবার নিজেরা খেতে পারে না, যে পোষাক নিজেরা পরতে পারে না গরীবদেরকে শুধু তাই দান করে থাকে। অথচ গরীবকে দান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর রেযামন্দি।

তবে কি আল্লাহর রেযামন্দি হাসিলের জন্য সবচেয়ে তুচ্ছ বস্তুটিই রয়ে গেল? কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা এই প্রবণতা পরিহারের আদেশ করেছেন এবং নিজের পছন্দের জিনিস আল্লাহর জন্য দান করতে উৎসাহিত করেছেন।

দেখুন : সূরা বাকারা : ২৬৭; সূরা আলে ইমরান : ৯২

এই হাদীস সেই কুরআনি শিক্ষারই একটি অংশ।

## পিতামাতাকে গালি দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সবচেয়ে জঘণ্য কবীরা গুনাহসমূহের একটি হচ্ছে, পিতামাতাকে অভিশাপ করা।' কেউ প্রশ্ন করল, 'সন্তান কীভাবে পিতামাতাকে অভিশাপ করে?'
উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে অন্যের পিতাকে গালি দেয় ফলে সে লোকও প্রতিউত্তরে তার পিতাকে গালি দেয়। সে অন্যের মাকে গালি দেয় প্রতিউত্তরে ঐ লোকও তার মাকে গালি দেয়।'
-সহীহ বুখারী ২/৮৮৩

**ফায়েদা :** এই প্রশ্নটি হাদীসের বাণী বোঝার জন্য প্রশ্ন। এ থেকে বোঝা যায়, হাদীস শরীফ শুধু পাঠ করাই যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞজনের নিকট থেকে তার মর্ম বোঝাও অপরিহার্য।

এই হাদীস থেকে পিতামাতার মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা যায়। তা হচ্ছে, পিতামাতাকে সরাসরি অভিশাপ করা তো কবীরা গুনাহ। জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে, যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলরূপে পিতামাতাকে অন্যের গালি ও অভিশাপ শুনতে হয়। কারণ সন্তানের এ ধরনের কাজ করার ফলে পিতামাতা যদি অন্যের গালির শিকার হন তাহলে এর দায় ও গুনাহ ঐ সন্তানকেও বহন করতে হবে।

## নবীর রহমত থেকে কি উম্মত বঞ্চিত হয়

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি রাগান্বিত হলেন এবং তাদেরকে তিরস্কার ও অভিশাপ করলেন।
তারা বিদায় নেওয়ার পর আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলে আপনার কাছে কল্যাণ লাভ করে, কিন্তু এরা তো কিছুই পেল না।' তিনি বললেন, 'কেন?' আমি বললাম, 'আপনি তাদেরকে তিরস্কার ও অভিশাপ করলেন।' উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি জান না, আমি আমার রবের নিকট থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে,

اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا.
ইয়া আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। সুতরাং কোনো মুসলমানকে আমি যদি অভিশাপ করি কিংবা তিরস্কার করি তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য তা পুরস্কার ও পবিত্রতায় পরিণত করে দিও।-সহীহ মুসলিম ২/৩২৩

**ফায়েদা :** এই প্রশ্নটি আল্লাহর নবীর আচরণের তাৎপর্য বোঝার জন্য প্রশ্ন। সীরাত বিষয়ক হাদীস শরীফ বোঝার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়ার শিক্ষা এখান থেকে পাওয়া যায়।

এই হাদীসের আরেকটি শিক্ষা এই যে, শাসনের প্রয়োজনে অধীনস্তদের কখনো তিরস্কার করতে হয়। তবে হাদীসের শিক্ষা এই যে, যাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে তাদের জন্য দুআও করা উচিত। তেমনি গোস্যার কারণে কারো প্রতি অভিশাপমূলক কোনো কথা মুখ দিয়ে এসে গেলে আল্লাহর কাছে তার কল্যাণের জন্য দুআও করা উচিত। যেন বড়র কারণে ছোট ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

## সর্বোত্তম আচরণের হকদার কে

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার?’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার মা।’ প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ‘তারপর কে?’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার মা।’ প্রশ্নকারী পুনরায় একই প্রশ্ন করলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন, ‘তোমার মা।’
চতুর্থবার প্রশ্ন করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপর তোমার বাবা। এরপর পর্যায়ক্রমে তোমার নিকটতর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন।
-সহীহ বুখারী ২/৮৮৩; সহীহ মুসলিম ২/৩১২

**ফায়েদা :** প্রশ্নটি হক্কদারের পর্যায় সম্পর্কে। কার হক কী তা যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি কার হক বেশি, কার হক কম-এ সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যাতে প্রত্যেকের সাথে তার প্রাপ্য আচরণ করা যায়।

## মা যদি কাফির হয়

হযরত আসমা রা. বলেন, আমার আম্মা মদীনা শরীফে আমার নিকট এলেন। তিনি তখন মুশরিক ছিলেন। ঐ সময় মক্কার মুশরিকদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্ধি ছিল।
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার আম্মা আমার নিকট এসেছেন এবং তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ। (এখন আমি তার সাথে কেমন আচরণ করব)?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মায়ের সাথে সুসম্পর্কের পরিচয় দাও।-সহীহ বুখারী ২/৮৮৪

**ফায়েদা :** জিজ্ঞাসা থেকেই বোঝা যায়, তাওহীদ ও শিরকের বিষয়ে মায়ের সাথেও যে আপোস করা যায় না এটা তাঁর সামনে পরিষ্কার ছিল। তবে সাধারণ আচরণের ক্ষেত্রে সন্তানের করণীয় কী তা জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাচারের আদেশ করেছেন। এ দুটো শিক্ষা কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।' (দেখুন : সূরা লুকমান : ১৪)

**মিথ্যা বলা**

হযরত আসমা রা. বলেন, একজন নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন সতীন আছে। আমি যদি তার কাছে স্বামীর কাছ থেকে এমন কিছু পাওয়ার ভান করি, যা আসলে স্বামী আমাকে দেয়নি, তাহলে কি আমার গুনাহ হবে?'
উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না পেয়েও যে পাওয়ার ভান করে সে যেন মিথ্যার এক প্রস্থ কাপড় পরিধান করেছে।'-সহীহ বুখারী ২/৭৮৫

**ফায়েদা :** অর্থাৎ সে যেন আপাদমস্তক মিথ্যার দ্বারা আবৃত, যা একজন মুমিনের শান নয়। মুমিন তো আপাদমস্তক সত্যের দ্বারা আবৃত থাকবে। কথায় ও কর্মে, বিশ্বাস ও আচরণে সে হবে সিদক ও সত্যের মূর্তপ্রতীক। এটি ইসলামের এমন এক শিক্ষা, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। সাহাবিয়া বিশেষ একটি আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দান করেছেন।

সিদক ও সত্যনিষ্ঠা যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এজন্য একজন সাধারণ সাহাবিয়ার কাছেও উপরোক্ত বিষয়টি প্রশ্নযোগ্য মনে হয়েছে। ফলে তিনি প্রশ্ন করেছেন এবং সিদকের পথে আরো অগ্রসর হওয়ার পাথেয় লাভ করেছেন।

## কবরের আযাব সম্পর্কে

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এক ইহুদী নারী তাঁর কাছে কবরের আযাবের কথা আলোচনা করে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে হেফাযত করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলে উম্মুল মুমিনীন তাঁকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন (যে, এটা কি সত্য?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।' -সহীহ বুখারী ১/১৮৩

**ফায়েদা :** এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, কোনো দ্বীনী বিষয়ে সংশয় হলে জিজ্ঞাসা করা চাই। নিজে নিজে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিংবা অনির্ভরযোগ্য কারো কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করা ঠিক নয়। কুরআন-সুন্নাহর সিদ্ধান্ত জানার জন্য মাহির আলিমকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

এই হাদীসের আরো শিক্ষা এই যে, **দ্বীনী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদেরও পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।**

## উত্তম স্ত্রী

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল 'উত্তম স্ত্রীর পরিচয় কী?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যার দিকে তাকালে স্বামী আনন্দবোধ করে, যে স্বামীর আদেশ পালন করে এবং নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদে তার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে।'-মুসনাদে আহমদ ২/২৫১

**ফায়েদা :** স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই রয়েছে কিছু কর্তব্য ও কিছু অধিকার। হাদীস শরীফে এগুলো পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসটি স্ত্রীর কর্তব্য সংক্রান্ত। এ হাদীসে চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। একজন স্ত্রী যদি এই নবী-শিক্ষাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তা অনুসরণে সমর্থ হন তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি।

হাদীস শরীফের প্রথম কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি একজন নারীকে কথায় ও আচরণে এমন প্রজ্ঞা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে উৎসাহিত করে, যা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ককে আনন্দপূর্ণ করে তোলে। হাদীসে আরো তিনটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা সহজেই বোধগম্য।

## প্রতিবেশীর হক

হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। আমি (কোনো কিছু হাদিয়া দিতে চাইলে) তাদের কোন জনকে দিব?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘দু’জনের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশি নিকটে।’-সহীহ বুখারী ১/৩০০

**ফায়েদা :** প্রতিবেশীর হক্ব সম্পর্কে হাদীস শরীফে খুব তাকীদ করা হয়েছে। এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, নিকট প্রতিবেশীর হক্ব দূরের প্রতিবেশী থেকে বেশি।
উম্মুল মুমিনীনের এই প্রশ্ন এবং পরবর্তী হাদীসের প্রশ্নটি শুধু হকদারের হক সম্পর্কে নয়; বরং হকদারের পর্যায়, অর্থাৎ কার হক বেশি, কার হক কম এ সম্পর্কে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। প্রত্যেকের সাথে ন্যায্য আচরণ করার জন্য হকদারের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি।

## কার হক সবচেয়ে বেশি

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নারীর উপর সবচেয়ে বেশি হক কার?' তিনি বললেন, 'স্বামীর।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'পুরুষের উপর সবচেয়ে বেশি হক কার?' উত্তরে তিনি বললেন, 'মায়ের।'-মুসতাদরাকে হাকেম

**ফায়েদা :** পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ যে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত উপরোক্ত হাদীসটি তার একটি প্রমাণ। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর উপর পুরুষের অধিকার শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হয় না। তেমনি নারী শুধু নারী হওয়ার কারণে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। এ কারণেই সন্তানের উপর পিতার চেয়ে মায়ের হক বেশি।

## মহিলাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া

হযরত কা'ব ইবনে মালেক রা. বলেন, আমাদের পালের একটি বকরি মারা যাচ্ছিল। তা দেখে আমাদের একজন দাসী তা জবাই করে দিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ বকরিটি খাওয়ার আদেশ করেন।-সহীহ বুখারী ১/৩০৮

**ফায়েদা :** এ প্রশ্নটি 'যবীহা' বা জবাইকৃত পশু সম্পর্কে। শরীয়তে যাবীহা সম্পর্কে বেশ কিছু বিধান দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের সময় ঐ সকল বিধান জেনে নেওয়া উচিত। এই হাদীস থেকে খাদ্যদ্রব্যের হালাল-হারাম সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

## আত্মীয়-স্বজনকে দান করা

উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এই গোলামটি আযাদ করতে চাই (কীভাবে করলে আমার জন্য উত্তম হবে)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি গোলামটি তোমার যে মামা গ্রামে থাকেন তাকে দান কর। এতে তোমার (গোলাম আযাদ করার চেয়ে) বেশি সওয়াব হবে।
-মুসনাদুল বাযযার-মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২৮১

**ফায়েদা :** নেক কাজের বিষয়ে, বিশেষত দান-সদকার বিষয়ে আলিমদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। কীভাবে কাজটি করলে দুনিয়া-আখিরাতে অধিক মঙ্গলজনক হবে তা আলিমরাই বলতে পারবেন।
এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, আত্মীয়-স্বজনকে দান করার ফযীলত সাধারণ দানের চেয়ে বেশি। আত্মীয়তার হক আদায় করা ইসলামী আদব-আখলাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

## কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষকে ওঠানো হবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন অবস্থায়।' একথা শুনে হযরত আয়েশা রা. প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী-পুরুষ বিবস্ত্র অবস্থায় সমবেত হলে একজন কি অপরজনের সতর দেখবে না?'
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

الأمر أشد من أن يهمهم ذاك

'সে দিনের অবস্থা এত কঠিন হবে যে, এই চিন্তারই সুযোগ থাকবে না।'-সহীহ বুখারী ২/৯৬৬

### বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা

হযরত আনাস রা. বলেন, বালক হারেসা রা. শহীদ হলেন। তার মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! হারেসা আমার কত প্রিয়

ছিল তা আপনি জানেন। সুতরাং সে যদি জান্নাতবাসী হয় তাহলে আমি সবর করব এবং আল্লাহর কাছে ছওয়াবপ্রার্থী হব।
কিন্তু এর বিপরীত হলে আমার আচরণ আপনি দেখতে পাবেন। (তখন আর ধৈর্য্যধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।)' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাত কি একটি!? জান্নাত তো অনেক। আর তোমার ছেলে তো রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসে।'-সহীহ বুখারী ২/৯৭০

**ফায়েদা :** এই হাদীসের প্রশ্নটি এমন, যা শুধু আল্লাহর রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে করা যায় না।
খাতামুন নাবিয়্যিনের পর যেহেতু ওহী-রেসালতের সূত্র বন্ধ তাই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সে জান্নাতী কি না তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। তবে তাঁর ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে আল্লাহর রহমতের কাছে আশাবাদী হওয়া যায় এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আশাবাদ ব্যক্তও করা যায়।

## শাহাদাতের আকাঙ্খা

হযরত আনাস রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাদা ইবনুছ ছামেত রা.-এর স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা.-এর বাড়িতে গেলেন। তিনি তাঁর মেহমানদারি করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন।
উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হাসলেন কেন?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের কিছু মানুষকে দেখানো হয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে এই সমুদ্রের উপর দিয়ে সফর করবে। ...।
আমি বললাম, 'আপনি দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন।' তিনি দুআ করলেন এবং পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন এবং আরেকটি দলের কথা বললেন আমি বললাম, 'আপনি দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।'

বর্ণনাকারী বলেন, মুআবিয়া রা.-এর যামানায় উম্মে হারাম রা. সমুদ্রে সফর করেন। এ সফর থেকে ফিরে তীরে নামতে গিয়ে তিনি সওয়ারী থেকে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। (ফলে পরের সমুদ্রযাত্রায় তিনি শামিল হতে পারেননি।)-সহীহ বুখারী ২/৯২৯

## নেককারের মৃত্যু

হযরত উবাদা ইবনুছ ছামিত রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে আল্লাহ তাআলাও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে না আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন না।' একথা শুনে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য কোনো স্ত্রী আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বিষয়টি এরকম নয়। যখন ঈমানদারের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন তাকে আল্লাহর রেযামন্দি ও তাঁর সাথে মোলাকাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তার কাছে আল্লাহর সাথে মোলাকাতের চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছুই থাকে না। সে তখন আল্লাহর সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে যায় ফলে আল্লাহও তার সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে যান।

পক্ষান্তরে যখন কাফেরের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন তাকে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির সংবাদ শোনানো হয়। ফলে তার কাছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চেয়ে অকাম্য বস্তু আর কিছুই থাকে না। সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।-সহীহ বুখারী ২/৯৬৩

**ফায়েদা :** প্রশ্নটি হাদীস শরীফের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে। বোঝা গেল, হাদীস শরীফ পাঠ করার সময় তার সঠিক মর্ম বোঝার চেষ্টা করা উচিত। এক্ষেত্রে জ্ঞানীর সহায়তা নেওয়াই হাদীসের শিক্ষা।

### মিসকীনের মর্যাদা

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন-

اللهُمَّ أَحْيِيْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইয়া আল্লাহ! দুনিয়াতে মিসকীন করে রাখুন, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং কিয়ামতের দিন মিসকীনদের জামাতে আমাকে শামিল করুন।

এই দুআ শুনে আয়েশা রা. আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন এই প্রার্থনা?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা (মিসকীনরা) ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।'-জামে তিরমিযী ২/৫৮

**ফায়েদা :** মাসনূন দুআসমূহে রয়েছে নূর ও বরকত। আর উপলব্ধির সাথে পাঠ করলে এর সুফল অনেক গুণ বেড়ে যায়।

হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে মাসনূন দুআর শিক্ষা ও তাৎপর্য সম্পর্কে ইলম হাসিল করা শরীয়তের কাম্য।

### স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'আমি তোমার রাগ ও অনুরাগ বুঝতে পারি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর রাসূল! কিভাবে বুঝতে পারেন?' তিনি বললেন, 'তুমি যখন আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন বলে থাক-'বালা ওয়া রাব্বি মুহাম্মাদ' (মুহাম্মদের রবের কসম! ...) আর অসন্তুষ্ট হলে বল-'লা ওয়া রাব্বি ইবরাহীম' (ইবরাহীমের রবের কসম!..।)'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আমি শুধু আপনার নামটিই ত্যাগ করি। (অন্তর আপনার ভালবাসায় পূর্ণ থাকে।')-সহীহ বুখারী ২/৮৯৭

**ফায়েদা :** এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীর স্বাভাবিক মান-অভিমানকে সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা 'বেআদবী' বলে গণ্য নয়।

## আল্লাহর আযাবের ভয়

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আকাশে মেঘ দেখা দিলে বা ঝড়ো বাতাস বইতে থাকলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখমন্ডলে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠত। আমি আরজ করলাম, 'আল্লাহর রাসূল! আকাশে মেঘ দেখলে মানুষ খুশি হয় এবং বৃষ্টির আশা করে, কিন্তু আপনার চেহারায় আমি চিন্তা ও ভয়ের ছাপ লক্ষ করি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আয়েশা! আমি কীভাবে জানব, এই মেঘ বা বাতাস কোনো আযাব বহন করে আনেনি? এক জাতির উপর তো প্রচন্ড বাতাস দ্বারা আযাব দেওয়া হয়েছে। তেমনি আরেক জাতি আযাব দেখে বলেছিল-

هذا عارض ممطرنا
এই তো মেঘ আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে!'
-সুনানে আবু দাউদ ২/৬৯৫

**ফায়েদা :** প্রশ্নটি 'হাল' বা অবস্থা সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলার সাথে যাঁর পরিচয় যত গভীর আল্লাহর আযাবের ভয় ও রহমতের আশাও তাঁর তত বেশি। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি আল্লাহকে চিনি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি এবং আল্লাহকে ভয় করি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি।'
প্রকৃতি আল্লাহরই সৃষ্টি এবং প্রকৃতির উপাদানগুলো তাঁর রহমত ও কুদরত দুটোরই পরিচয় বহন করে, বিশেষত প্রকৃতির যেসব শক্তি দ্বারা আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ধ্বংস করেছেন সেগুলো তো তাঁর কহর ও জালালের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষ হয়তো তা থেকে গাফেল থাকতে পারে, কিন্তু সবার চেয়ে বেশি খোদাভীরু যিনি তিনি তো এই দুর্বলতার বহু উর্ধ্বে। তাই তার অবস্থাও অন্যদের চেয়ে ভিন্ন।
এই ব্যতিক্রমটিই উম্মুল মুমিনীনের চোখে পড়েছে এবং তিনি প্রশ্ন করেছেন। তাঁর প্রশ্নের কারণে মারিফাতে খোদাবন্দির এক গভীর অধ্যায় উন্মুক্ত হয়েছে। এই হাদীসে রয়েছে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তার শিক্ষা এবং আল্লাহর আযাব থেকে গাফেল হওয়ার চিকিৎসা।

## ঈসালে সওয়াব

হযরত আবু উসাইদ সায়েদী রা. বলেন, একবার বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচারের কোনো পথ কি অবশিষ্ট আছে?'
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ। তাদের জন্য দুআ করা, তাদের পক্ষ হতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাদের অঙ্গিকার পূরণ করা এবং তাদের বন্ধুবান্ধবের সম্মান ও তাঁদের সূত্রে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তা অটুট রাখা।'
-সুনানে আবু দাউদ ২/৭০০

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/463/ & https://www.alkawsar.com/bn/article/505/ ]

## লাইলাতুল কদরে কী দুআ করব

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যদি লাইলাতুল কদর পাই তখন কী দুআ করব? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুআ করবে-

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

(ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি অতি ক্ষমাশীল। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।)
-মুসনাদে আহমদ ৬/১৭১, হাদীস : ২৫২৬০

## অগ্রবর্তীর হক

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, (হজ্বের সময়) আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বা ভবন নির্মাণ করব, যা আপনাকে রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করবে?’
জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘না, মিনা হল যে আগে যাবে তার অবস্থানস্থল।’-সুনানে আবু দাউদ ১/২৭৬

## অকস্মাৎ মৃত্যুর মূল্যায়ণ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নবী বললেন, ‘এটি ঈমানদারের জন্য

স্বস্তি ও শান্তির কারণ। আর অক্ষম (পাপাচারীর) জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ।’-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৪৯২৩

**ফায়েদা :** এই হাদীসের ‘আজিয’ বা অক্ষম শব্দের ব্যাখ্যা অন্য হাদীসে আছে। তাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অক্ষম ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগামী করে আর আল্লাহ সম্পর্কে অলীক আশা পোষণ করে।’

## মহামারীর হাকীকত

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘এটা হচ্ছে আযাব। আল্লাহ তাআলা তার যে বান্দাদের উপর ইচ্ছা তা প্রেরণ করেন। আর মুমিনদের জন্য আল্লাহ সেটিকে রহমত বানিয়ে দেন।

যখন কোনো এলাকায় মহামারি দেখা দেয় আর মুমিন ব্যক্তি সবর ও সওয়াবের নিয়তে এই বিশ্বাস রেখে নিজ এলাকাতেই অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই তাকে আক্রান্ত করতে পারবে না তাহলে সে শহীদের সওয়াব লাভ করবে।-সহীহ বুখারী ১/৪৯৪

**ফায়েদা :** উপরের দুটো হাদীসে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, যাকে সাধারণত অশুভ মনে করা হয়। জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, একই বিষয় পাত্রভেদে শুভ হতে পারে, আবার অশুভও হতে পারে। এটা নির্ভর করে ব্যক্তির বিশ্বাস ও কর্মের উপর। কাফিরের জন্য যা আযাব ঈমানদারের জন্য, তার ঈমানের গুণে তা হয়ে যেতে পারে রহমত।

এই হাদীস থেকে আরো শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোনো মুমিন-মুসলমানকে বিপদগ্রস্ত হতে দেখলে তার সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।

### সুসংবাদ, দুঃসংবাদ

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, (উম্মুল মুমিনীন) হযরত খাদীজা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকাহ বিন নাউফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছেন, 'আমি তাকে স্বপ্নে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমার ধারণা, সে যদি জাহান্নামী হত তবে তার পরনে সাদা কাপড় থাকত না।'

-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৪২৪৮

## কিয়ামতের দিন কেউ কাউকে স্মরণ করবে কি?

হযরত আয়েশা রা. একবার জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছ কেন?'

তিনি বললেন, 'জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। আপনাদের কি কিয়ামতের দিন নিজেদের পরিবার-পরিজনের কথা মনে থাকবে?'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনটি সময় এমন হবে, যখন কেউ কাউকে মনে করবে না।

১. আমল ওজনের সময়, যতক্ষণ না জানা যাবে, তার (নেক) আমলের পাল্লা ভারি হচ্ছে না হালকা হচ্ছে।

২. আমলনামা দেওয়ার সময়, যখন ঘোষণা করা হবে, এসো, আমলনামা পড়ে দেখ, যতক্ষণ না নিশ্চিত হবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে আসছে, নাকি বাম হাতে, নাকি পিঠের পিছন দিকে!

৩. পুলসিরাতে। যখন তা জাহান্নামের সামনে বিছানো হবে।

-সুনানে আবু দাউদ ২/৬৫৪

## অবাধ্যচারীর সঙ্গ গ্রহণের পরিণাম

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘একটি বাহিনী কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আসতে থাকবে। যখন তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন বাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি লোক মাটিতে ধ্বসে যাবে।’

উম্মুল মুমিনীন আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের মধ্যে তো এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শুধু পণ্য বিক্রির জন্য তাদের সাথে থাকবে। তেমনি আরো এমন লোকজন থাকবে, যারা ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়? (অর্থাৎ যারা যোদ্ধা নয় এবং যাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নয়)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘প্রতিটি লোক মাটিতে ধ্বসে যাবে এরপর (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার নিয়ত অনুযায়ী ওঠানো হবে।’-সহীহ বুখারী ১/২৮৪

## নেয়ামতের শোকরগোযারী

হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, তার পা মুবারক ফুলে যেত। উম্মুল মুমিনীন আরজ করলেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এমন করেন, আল্লাহ তাআলা তো আপনার আগের পরের সবকিছু মাফ করে দিয়েছেন।’

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘আমি কি আল্লাহর শোকর গোযার বান্দা হব না?’

-সহীহ বুখারী ১/২৮৪

## শয়তানের অনিষ্ট সম্পর্কে সতর্কতা

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এক রাত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে কোথাও (জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে) গেলেন। এতে আমার মনে ক্ষোভ জাগল। (কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, আল্লাহর রাসূল অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন)

কিছুক্ষণ পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে যখন আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন, আয়েশা! তোমার কী হয়েছে? তোমার মনে কি ক্ষোভ জেগেছিল? (অন্য রেওয়ায়েতে আছে, উম্মুল মুমিনীন তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে গেলেন। সেখানে তাঁকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘরে ফিরে এলেন এবং হাঁপাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহর রাসূল ঘরে ফিরলেন এবং তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন।)

আয়েশা রা. বললেন, আমার মতো (নারীর) কি আপনার মতো (স্বামীর) জন্য ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক নয়?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার শয়তানটি কি তোমাকে ধরে ফেলেছে?

আয়েশা রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে কি শয়তান আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আয়েশা রা. বললেন, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আয়েশা রা. আবারো বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও কি আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার রব আমাকে সাহায্য করেছেন।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৪৭২৬

**ফায়েদা :** স্ত্রীর মান-অভিমান, এমনকি ভুল ধারণাকেও সহজভাবে নেওয়ার এক আদর্শ উদাহরণ, তেমনি ছোট ও অধীনের সরলতাপূর্ণ প্রশ্নের শান্ত ও সঠিক উত্তর দেওয়ার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

## মাসনূন দুআর সূত্র

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পূর্বে এ দুআ বেশি বেশি পড়তেন-

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

উম্মুল মুমিনীন বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনাকে এই কালিমাগুলো পড়তে দেখছি। (এর তাৎপর্য কী?)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার জন্য একটি লক্ষণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যখন আমি তা উম্মতের মধ্যে দেখতে পাব তখন এই কালিমাগুলো পাঠ করব।
এরপর তিনি সূরা নাসর শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।-সহীহ মুসলিম ১/১৯২

## পাক-পবিত্রতা

পবিত্রতা দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন নামায পবিত্রতার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে এ বিষয়ক বিধান জানা নারী-পুরুষ সকলের জন্য অতি জরুরি। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ক ইলম অর্জন করেছেন। কোনো দ্বিধা ও সংকোচ তাদের ইলম অর্জনের পথে বাধা হতে পারেনি।
নারীরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকার চেয়ে সংকোচ ত্যাগকেই তাঁরা শ্রেয় মনে করেছেন। এ ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যাবে।

## ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর পবিত্রতা

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, উম্মে হাবীবা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইলেন যে, আমার ঋতুকালের বাইরেও সর্বদা রক্ত আসে। (আমি কীভাবে পবিত্র হব এবং নামায আদায় করব?)
উত্তরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এটি হল ইরক। অতএব তুমি গোসল করে নামায আদায় করবে।’
এরপর উম্মে হাবীবা রা. প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করতেন।
-সহীহ মুসলিম ১/১৫১

## কাপড়ের পবিত্রতা

হযরত আসমা রা. বলেন, এক নারী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানতে চাইল, কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে তা কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমে হাত দ্বারা খুঁটে তুলে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এরপর ঐ কাপড়ে নামায আদায় করতে পারবে।
-সহীহ বুখারী ১/৪৫

## মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, আবু তালহা রা.-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা সত্যের বিষয়ে নিঃসঙ্কোচ। (তো আমার জিজ্ঞাসা এই যে,) কোনো নারীর স্বপ্নদোষ হলে কি তার উপর গোসল ফরয হয়?'
উত্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ। যদি সে পানি (ভেজা) দেখতে পায়।'
-সহীহ বুখারী ১/৪২

## নারীর জন্য ফরয গোসলে চুলের বেণী খোলার প্রয়োজন নেই

হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি মাথার চুলে বেণী করে থাকি। ফরয গোসলের জন্য কি তা খুলতে হবে?'
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না। তুমি শুধু মাথায় তিনবার পানি ঢালবে তারপর পুরো শরীরে পানি ঢালবে এবং ভালোভাবে পবিত্র হবে। (অর্থাৎ বেনী

খোলার প্রয়োজন নেই, চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছা ও গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট।)'-সহীহ মুসলিম ১/১৪৯

## ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর নামায

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, 'আমার ঋতুকালের বাইরেও স্রাব চালু থাকে। আমি কখনো পবিত্র হই না। এ অবস্থায় আমি কি নামায পড়া থেকে বিরত থাকব?'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না। এটা হল ইরক। ইতিপূর্বে তোমার যে কয়দিন স্রাব আসত ততদিন তুমি নামায পড়া বন্ধ রাখবে। তারপর গোসল করবে এবং নামায আদায় করবে।'-সহীহ বুখারী ১/৪৭

## সালাত-প্রসঙ্গ

### নামাযের পোশাক

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, নারী কি ইযার ছাড়া শুধু একটি চাদর ও ওড়না পরে নামায পড়তে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাদর যদি এত লম্বা হয় যে, তার পায়ের পাতাও ঢেকে যায় (তাহলে ইযার ছাড়াও নামায সহীহ হবে)।-সুনানে আবু দাউদ ১/৯৪

### মহিলারা নিজের ঘরে নামায পড়বে

হযরত উম্মে হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছে হয় আপনার সাথে নামায পড়ি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে আগ্রহী। তবে (জেনে রেখ) নিজের ঘরের নিভৃত কোণে নামায

পড়া তোমার জন্য বারান্দায় নামায পড়া থেকে উত্তম। বারান্দায় নামায পড়া উঠোনে নামায পড়া থেকে উত্তম। নিজ বাড়িতে নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে এসে নামায পড়া থেকে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, (একথার পরে) উম্মে হুমাইদ রা. তার গৃহের সবচেয়ে নির্জন ও অন্ধকার স্থানে তার জন্য নামাযের জায়গা তৈরির আদেশ করেন এবং সে স্থানেই নামায আদায় করতে থাকেন। এ অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ তাআলা সান্নিধ্যে চলে যান।-মুসনাদে আহমদ ৬/৩৭১

**ফায়েদা :** মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের ফযীলত সবারই জানা আছে। সেখানে এক নামাযের ছওয়াব মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের এক হাজার নামাযের সমান গুণ। আর স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে জামাতে নামায পড়ার ফযীলত যে কত বেশি তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে তাঁর পিছনে নামায পড়ার চেয়েও মহিলাদের জন্য নিজের ঘরে নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন।

এ হাদীসে অনুত্তম হলেও নারীর মসজিদে এসে নামায আদায়ের যে অনুমতির দিকটি রয়েছে, অন্যান্য হাদীস ও শরীয়তের নীতিমালা থেকে বোঝা যায়, এ অনুমতিরও বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, যা বর্তমান সময়ে পুরোপুরি পালন করা হয় না।

বর্তমান যুগের কথা তো বলাই বাহুল্য, খায়রুল কুরূনেও এ বিষয়ে শিথিলতা শুরু হয়েছিল, যার কারণে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেছিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আজকের মেয়েদের আচরণ (সজ্জাপ্রিয়তা) দেখতেন, তাহলে তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন বনী ইসরাইলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।

**নামাযে এদিক সেদিক তাকানো**

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ হল ছিনতাই, বান্দার নামাযের কিছু অংশ শয়তান ছিনিয়ে নিল।-সহীহ বুখারী ১/১০৪

**বিশেষ নামায**

হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ে আমার ঘরে এলেন এবং দুই রাকাত নামায পড়লেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আজ এমন একটি নামায পড়েছেন, যা সাধারণত পড়েন না। তিনি বললেন, আমার কাছে (গনীমতের) কিছু সম্পদ এসেছিল (সেগুলো বণ্টন করতে গিয়ে) যোহরের পরের দুই রাকাত নামায পড়তে পারিনি। সেই দুই রাকাত নামায এখন পড়ে নিলাম।

উম্মে সালামা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরও যদি কখনো এই দুই রাকাত নামায ছুটে যায় আমরাও কি তা কাযা করব? তিনি বললেন, না।-মুসনাদে আহমদ ৬/৩১৫

**যাকাত-সদাকা**

হযরত উম্মে সালামা রা. স্বর্ণের কিছু গয়না পরতেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি 'কানয' বলে গণ্য হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তুমি এর যাকাত আদায় কর তাহলে তা 'কানয' নয়।-মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৭

**ফায়েদা :** এখানে কানয বলে সূরা তাওবার আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আয়াতটি এই, (তরজমা) আর যারা স্বর্ণ ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী যুবাইরের দেওয়া সামান্য কিছু সম্পদ ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ নেই। আমি কি তা সদকা করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি দান কর, হিসাব করো না। নতুবা তোমাকে দেওয়ার ক্ষেত্রেও হিসাব করা হবে।

-সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৫৯০

## আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করা

হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আমার স্বামী আবু সালামা রা.-এর সন্তানদের

জন্য ব্যয় করি তাহলে কি আমার ছওয়াব হবে, তারা তো আমারও সন্তান। তিনি বললেন, তাদের জন্যও খরচ কর; এর ছওয়াবও তুমি পাবে।-সহীহ বুখারী ১/১৯৮

**আত্মীয়স্বজনকে নফল দান করা**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার মাঠে মহিলাদেরকে সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

ওয়াজ শেষে যখন ঘরে ফিরলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী যায়নাব রা. এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সদকা করার আদেশ করেছেন। আমার কাছে একটি গয়না ছিল আমি তা সদকা করার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু আমার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলছেন, তিনি ও তার সন্তানরা এই দানের বেশি হকদার।

রাসূলুল্লাহ  বললেন, ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছেন। তোমার স্বামী ও সন্তানরাই তোমার দানের বেশি হকদার।-সহীহ বুখারী ১/১৯৭

**মৃতের পক্ষ থেকে সদকা করা**

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে সদকা করতেন (অর্থাৎ সদকা করার কথা বলতেন) এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে কি তিনি এর ছওয়াব পাবেন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।-মুসনাদে আহমদ ১৭/২৭২

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/525/

& https://www.alkawsar.com/bn/article/626/ ]

## রমযান ও রোযা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি ও হাফসা নফল রোযা রেখেছিলাম। আমাদের কাছে কিছু খাবার  হাদিয়া এল। আমরা তখন খাবার খেয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলি। যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে কিছু খাবার হাদিয়া এসেছিল। খাবারের চাহিদা থাকায় আমরা নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলি।

এখন আমাদের কী করতে হবে? তিনি বললেন, অসুবিধা নেই, তোমরা এই রোযার জায়গায় আরেকদিন রোযা রাখ।-সুনানে আবু দাউদ ১/৩৩৩

**ফায়েদা :** যদিও নিয়ম হল ঘটনার আগে বিধান জেনে নেওয়া, কিন্তু সব সময় তা হয়ে ওঠে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে পরে বিধান জেনে নেওয়া জরুরি। অজ্ঞতার মধ্যে থাকা উচিত নয়। তেমনি নিজে নিজে কোনো একটি 'ব্যাখ্যা' করে সন্তুষ্ট থাকাও উচিত নয়।

## রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রী মিলন

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আল্লাহর রাসূল! এই হতভাগা রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে! (এখন তার কী উপায়?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি একটি কৃতদাস আযাদ করার সামর্থ আছে? সে বলল, জী না।
তিনি বললেন, তাহলে ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, জী না। তিনি বললেন, তাহলে তোমার কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ আছে? লোকটি বলল, তা-ও নেই। এসময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একপাত্র খেজুর হাদিয়া এল।
তিনি লোকটিকে বললেন, এগুলো তোমার পক্ষ থেকে গরিবদের মাঝে দিয়ে দাও। সে বলল, আমাদের চেয়েও গরিবকে দিব? মদীনার দুই সীমান্তের মাঝে তো আমাদের চেয়ে গরিব আর কেউ নেই। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকেই খাইয়ে দাও।-সহীহ বুখারী ১/২৬০

**ফায়েদা :** রমযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভাঙ্গা অনেক বড় গুনাহ। ঈমানদার এই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কখনো শয়তানের ধোকায় পড়ে গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয় এবং গুনাহমাফির পথ অন্বেষণ করে।
এই হাদীসে কাফফারার বিবরণ আছে। তবে প্রশ্নকারী হতদরিদ্র হওয়ায় প্রথমে নিজের পরিবারের প্রয়োজন পূরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

## স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখবে না

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট এসে আরজ করলেন, আল্লাহর নবী! স্ত্রীর উপর স্বামীর কী কী হক আছে?

তিনি বললেন, স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখবে না, তবে ফরয রোযা এর ব্যতিক্রম। স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখলে গুনাহগার হবে এবং তার রোযা কবুল হবে না।

-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/৩১৭

**ফায়েদা :** অন্যের হক সম্পর্কে ইলম অর্জন করা ছিল সাহাবায়ে কেরামের একটি বৈশিষ্ট্য। এটিই হচ্ছে সামষ্টিক জীবনের সুখ-শান্তির চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে অন্যের হক সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নিজের হকের চুলচেরা হিসাবের প্রবণতা সকল আপত্তির মূল।

আর অখিরাতেও তারই জিত হবে যিনি সর্বদা অন্যের হক আদায়ে সচেষ্ট থাকবেন। চিন্তাশীলগণ এই ইসলামী দর্শনের সাথে বর্তমান সময়ের অধিকার আদায়ের দর্শনকে তুলনা করে দেখতে পারেন।

## মহিলাদের উত্তম জিহাদ হল হজ্ব

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলে জানি। তাহলে আমরা কি জিহাদ করবো না?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ, হজ্বে মাবরুর।-সহীহ বুখারী ১/২০৬

**ফায়েদা :** সঠিকভাবে আমলের জন্য যেমন চাই আমলের জযবা তেমনি চাই ইলমের রাহনুমায়ী। তাই যে কাজ করতে চাই আগে সে সম্পর্কে ইলম হাসিল করি তারপর আমল করি।

আর ইলম হাসিল করার অন্যতম মাসনুন তরীকা হল আলিমকে জিজ্ঞাসা করা।

## স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীরা হজ্বে যাবে না

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না এবং কেউ কোনো নারীর কাছে যাবে না তার নিকটে মাহারামের উপস্থিতি ছাড়া।''
জনৈক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুক বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। আর আমার স্ত্রী হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা করেছে (এখন আমি কী করতে পারি?) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমিও তার সাথে (হজ্বে) যাও।
-সহীহ বুখারী ১/২৫০২; সহীহ মুসলিম ১/৪৩৪

**ফায়েদা :** জিহাদে যাওয়া অনেক বড় নেক আমল। তবে নফল জিহাদের চেয়েও বড় নেক আমল স্ত্রীর পর্দা-পুশিদা এবং ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা।

## ঋতু চলাকালীন সময় তাওয়াফ করবে না

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দীকা রা. বলেন, আমি (হজ্বের ইহরাম বেঁধে) মক্কায় এলাম। তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। তাই আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিনি।
আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (এই সমস্যার কথা বলে) প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হাজ্বীরা যা যা করে তুমিও করতে থাক। তবে পবিত্র হওয়ার আগে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করো না।-সহীহ বুখারী ১/২২৩

**ফায়েদা :** নারী ও পুরুষের যে কোনো সমস্যার সুন্দর সমাধান ইসলামে আছে। তবে জিজ্ঞাসা করতে হবে বিজ্ঞ আলিমকে।

## অসুস্থ হলে বাহনে চড়ে হলেও তাওয়াফ করতে হবে

উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার অসুস্থতার অনুযোগ করলাম। তিনি আমাকে বললেন তুমি সওয়ারীতে চড়ে সবার পিছন দিয়ে তাওয়াফ কর। আমি মানুষের পিছন দিয়ে তাওয়াফ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর পাশে নামায পড়ছিলেন। এবং সূরা তূর তিলাওয়াত করছিলেন।-সহীহ বুখারী ১/২১৯

## তাওয়াফে বিদার আগে স্রাব শুরু হলে

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, হজ্বের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা.-এর ঋতুস্রাব শুরু হল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বললেন, সে তো আমাদেরকে আটকে দিল!

লোকেরা বলল, তিনি তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। একথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আর অপেক্ষা নয়।-সীহহ বুখারী, হাদীস ১৭৫৭; মুসনাদে আহমদ ৬/২৫৪

**ফায়েদা :** তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের পর তাওয়াফে বিদার আগে কোনো নারীর ঋতুস্রাব হলে তার উপর তাওয়াফে বিদার হুকুম থাকে না। সুতরাং তাকে তাওয়াফে বিদার জন্য মক্কা শরীফে অপেক্ষা করতে হবে না; তাওয়াফে বিদা ছাড়াই স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারবে।

## মাজুরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, বিদায় হজ্বে খাছআম গোত্রের একজন নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার

বাবার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে, কিন্তু এত বৃদ্ধ যে, সওয়ারীর উপর থাকতে পারেন না। সুতরাং আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারি? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।-সহীহ বুখারী ১/২৫০, সহীহ মুসলিম ১/৪৩১

## মৃতের পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব

হযরত বুরাইদাহ রা. বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি হজ্ব করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্ব কর।-সহীহ মুসলিম ১/৩৬২

## মান্নত হজ্বের বদলি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিকট এসে বললেন, আমার মা হজ্বের মান্নত করেছিলেন। কিন্তু তা আদায় করার আগেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারব?

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘‘তার পক্ষ থেকে হজ্ব কর। তোমার মায়ের কোনো ঋণ থাকলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর ঋণও আদায় কর। আল্লাহর ঋণ আরো বেশি আদায়যোগ্য।

-সহীহ বুখারী ১/২৫০

## ইলমের পিপাসা ও পরিচর্যা : মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ.-এর দুই মেয়ে

মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ.-এর কয়েকজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে দুই মেয়ে বেঁচে ছিল। বড় মেয়ের নাম **রাহীমা খাতুন**। ছোট মেয়ের নাম **যায়নাব খাতুন**।

আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। তাদের ইলম অর্জনের আগ্রহের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। অতি অল্প বয়সেই তারা যেসমস্ত কিতাব পড়ে ফেলেছেন, শুনলে অবাস্তব মনে হয়।

পিতা নিজেই তাঁদের অনেক প্রশংসা করতেন। বড় মেয়ে সম্পর্কে বলেন, আমার কলিজার টুকরা মেয়েটি যদি পুরুষ হত তাহলে মাশাআল্লাহ অনেক বড় আলেম হত। কিংবা বিবাহটাও যদি কিছু দেরিতে হত তাহলে ফাযেলা বনে যেত। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা, চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার বিবাহ হয়ে গেল এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এভাবে বিভিন্ন সময় উভয় মেয়ের কথা বলতেন।

বড় মেয়ে সম্পর্কে হযরত মুফতী ছাহেব নিজেই বলেন তার জেহেন-মেধা এবং কিতাবাদী বুঝার ও মুখস্ত করার যোগ্যতা প্রখর ছিল। অত্যন্ত বুঝমান এবং মেধাবী ছিল। কিতাবের যত কঠিন বিষয় হোক অত্যন্ত পরিপূর্ণতার সাথে উপস্থাপন করতে পারতো। ইবারাতের স্বাভাবিক অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন। সবক শুনাতে অথবা সামনের পড়া পড়তে ইবারত (আরবী পাঠ) খুব দ্রুততার সাথে পড়তে পারত। নির্ভুল পড়ত। হস্তাক্ষর ছিল পরিষ্কার ও সুন্দর। যে কোনো বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে পারত।

মুফতীয়ে আযম রাহ. বলেন, অনেক সময় আমি তাকে দিয়ে ফতোওয়াও নকল করিয়েছি। ফারায়েয ও (মিরাছ বণ্টন-হিসাব) করিয়েছি। মাশাআল্লাহ ফারায়েযে সে খুবই দক্ষ ছিল।

মুহতারামা রহীমা খাতুন তার নিজের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে বলেন, আমাদেরকে পড়ানোর ক্ষেত্রে আব্বাজান রাহ.-এর সীমাহীন আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাআলার অসীম মেহেরবানী তিনি আমাদেরকেও দ্বীনি ইলম অর্জন করার সীমাহীন আগ্রহ দান করেছেন। আব্বাজান রাহ. আমাদেরকে যত্নের সাথে পড়াতেন। আমি, ছোট বোন যায়নাব এবং ঘরের অন্যান্য বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আযীযুল্লাহ ছাহেব রাহ.-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আমি দশ বছর বয়সেই সম্মানিত উস্তাযের কাছে উর্দু-ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবগুলো এবং ইলমে ছরফের মীযান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ এবং ইলমে নাহুর নাহবেমীর পরিপূর্ণরূপে শিখে ফেললাম। তিনি আরো বলেন, আমি এই কিতাবগুলো যতটুকু পড়েছি যায়নাবও

আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদজীর কাছে ততটুকু পড়েছে। তবে যায়নাব ইলমে ছরফে অনেক পাকা ছিল। কোনো ছীগা জিজ্ঞাসা করলে সাথে সাথে বলে দিতে পারত। যায়নাবের দক্ষতা সম্পর্কে আব্বাজান রাহ. বলেন, একবার আমার দোস্ত মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মাজীদ শাহ ছাহেব রাহ. এবং মাওলানা আবুল হাসান রাহ. ও মাওলানা নূর আহমদ ছাহেব রাহ. আমাদের ঘরে এলেন। খানাপিনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর যায়নাবকে আমার রচিত 'তালীমুল মুবতাদী' থেকে কিছু প্রশ্ন করলেন। যায়নাবের বয়স ছিল তখন খুবই কম। কিন্তু মাশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। তখন শাহ ছাহেব রাহ. খুব খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কার দিলেন।

মুফতীয়ে আযম রাহ. বলেন, 'তালীমুল মুবতাদী' রচনা করার প্রেক্ষাপট ছিল; আদরের কন্যা যায়নাবের আরবী সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য কিছু জুমলা আরবীতে লিখিয়ে দিতাম। এভাবে কিছু লেখা একত্রিত হয়ে একটা কিতাবের আকার ধারণ করে।

মুহতারামা রহীমা খাতুন আরো বলেন, দশ বছর বয়সেই নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর পড়াশোনার আগ্রহ আরো বাড়তে থাকল। আব্বাজান রাহ.-এর ইচ্ছাও এটাই ছিল যে, উস্তাদজীর কাছে প্রচলিত সমস্ত কিতাবই পড়ব। পরে যখন উস্তাদজীর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করলাম তখন আব্বাজান নিজেই ঘরের মধ্যে খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো শুরু করলেন। ফজর এবং জোহর নামাযের পরে এবং রাতে পড়াতেন।

উস্তাদজীর কাছে পড়া কিতাবগুলো ছাড়াও আব্বাজান প্রথমেই কারীমা, পান্দেনামা আত্তার, গুলিস্তা, বোস্তা এবং ফার্সী কিতাবগুলোর পাশাপাশি আরবী মুফীদুত তালেবীন, তালীমুল মুতাআল্লিম, কালয়ূবী, কাসীদাহ বুরদাহ, নাফহাতুল আরব এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রাহ.-এর প্রসিদ্ধ কিতাব আলফুরকান ইত্যাদি পড়ালেন।

ফিকহের মধ্যে মা-লা-বুদ্দামিনহু, কুদুরী এবং আব্বাজান রাহ.-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আরবী ও ফার্সিও পড়ালেন।

আমার বয়স যখন তের বসর তখন আব্বাজান রাহ. আমাকে উলূমে আরাবিয়্যাহ এবং ফিকহের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য হেদায়া পড়াতে শুরু করলেন। আব্বাজান রাহ. হেদায়া শুরু করার পর আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে পড়তে লাগলাম। হেদায়ার পাশাপাশি আরো দু'তিনটি বিষয়ের দু'তিন কিতাবও পড়লাম।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাত-দিন মুতালাআয় ডুবে থাকতাম। আমার পড়াশোনার জন্য আলাদা একটা কামরা ছিল। পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে বিধায় আম্মার সাথে থাকার পরিবর্তে ঐ কামরায় থাকতাম এবং রাতেও  সেখানে থাকতাম। কোনো কোনো সময়

এমন হতো যে, যথেষ্ট পরিমাণ রাত জাগার পর আব্বাজান রাহ. এসে শুয়ে যাওয়ার নির্দেশ করতেন। আব্বাজানের কথা অনুযায়ী বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম। কখনো আবার এই কৌশল করতাম যে, 'হারিকেনের চিমনী কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতাম' যেন তিনি মনে করেন আমি শুয়ে পড়েছি।

হযরত মুফতী ছাহেব রাহ. একবার হাটহাজারীর জামে মাসজিদে তাঁর বুধবারের বয়ানে বলেন, যেদিন মেয়ে রহীমা খাতুন তাফসীরে জালালাইন শুরু করল ঐদিনের কথা, আমি রাতের যথেষ্ট অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো প্রয়োজনে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। দেখতে পেলাম রাহীমার ঘরে বাতি জ্বলছে। এত রাতে তার ঘরে আলো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চুপি চুপি তার কামরার কাছে গেলাম। দেখলাম, সে জালালাইন শরীফের মুতালাআয় ডুবে আছে। এটা দেখে আমার আর খুশীর সীমা রইল না। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

বড় মেয়ে রহীমা খাতুন বলেন, হেদায়া শুরু করার পর নিয়মিত পড়তে থাকলাম এবং অল্প দিনেই হেদায়ার প্রথম দু'খণ্ড শেষ হয়ে গেল। তখন আব্বাজান রাহ. আবার পড়াতে শুরু করলেন। পাশাপাশি মিশকাত শরীফ-এরও ছবক দিলেন। মিশকাত শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দে শব্দে পড়ালেন এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. রচিত أشعة اللمعات (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) পূর্ণ চার খণ্ড সমাপ্ত করালেন।

মিশকাত শরীফ أشعة اللمعات সহ যখন সমাপ্ত হল তখন আমার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হল। আবার যখন মিশকাত শরীফ পুনরায় পড়তে শুরু করলাম তখন হেদায়া আখেরাইন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) এবং জালালাইন শরীফ সবক দিলেন। আর তখনি আমার বিবাহ হয়ে গেল। আলহামদু লিল্লাহ বিবাহের পূর্বেই এ সমস্ত কিতাবাদি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেল। তিনি আরো বলেন, ইলম অর্জনের যে তীব্র আকাংখা ছিল বিবাহের পর তাতে ভাটা পড়ল। কুতুবে সিত্তা (ছিহাহ ছিত্তা) খতম করার যে তামান্না অন্তরে ছিল সেটাও পূর্ণ হল না। এজন্য যদি জীবনের শেষ পর্যন্তও আফসোস করি তা কমই হবে।

এখন শুধু কবির এ কথায় সান্তনা খুঁজি- 'মানুষ যা কামনা করে তার সবটাই সে পায় না / বাতাস জাহাজের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়'।

অবশ্য বিবাহের পরে মুয়াত্তা মুহাম্মাদ এবং সীরাজী পড়েছি।

মুফতীয়ে আযম রাহ. বলেন, রাহীমার ফারায়েযের ক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা ছিল, কিন্তু বিবাহের পরে ঘরের ঝামেলা এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে নিবিড়ভাবে পড়াশোনার সুযোগ সে পায়নি। এর মাঝেই যতটুকু সম্ভব হয়েছে চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

মুহতারামা রহীমা খাতুন আরো বলেন, ছোট বোন যায়নাব উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আযীযুল্লাহ ছাহেবের কাছে নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর আব্বাজান রাহ. 'তালীমুল মুবতাদী', 'ফয়যুল কালাম' 'হিদায়াতুল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাব পড়ালেন। ইন্তেকালের আট-নয় বছর পূর্বে আব্বাজান রাহ. আমাদের দু'বোনকে কুরআনের তরজমা জরুরি তাফসীরসহ পড়িয়ে দিলেন। আমার তো কিছু কারণে কখনো কখনো অনুপস্থিতি হয়ে যেত। কিন্তু ছোট বোন যায়নাব ঠিকই আব্বাজানের কুরআনের দরস দ্বারা উপকৃত হতে থাকল। আব্বাজান রাহ. আমাদেরকে যে পরিমাণ ভালবাসতেন, তা প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই। আম্মাজান রাহ. বলেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আব্বাজান রাহ. কোথাও গেলে ঘরে এসে প্রথমেই আমাকে কোলে নিতেন। আমাদের খোঁজখবর নিতেন। আর সবচেয়ে বড় ভালবাসা হল তিনি আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখিয়েছেন। যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না।

**আখলাক-চরিত্র :** বড় মেয়ের আখলাক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এক দৃষ্টান্তহীন নারী ছিলেন তিনি। তার স্বভাব-চরিত্র ছিল প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা মুফতীয়ে আযম রাহ.-কে যে সমস্ত বিরল গুণ এবং নমুনাহীন চরিত্র দান করেছেন তার সবটাই তিনি পেয়েছিলেন। আচার আচরণ, চলা-ফেরা, অভ্যাস-রীতি মোটকথা জিন্দেগীর সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত পিতার অবিকল প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

ছোট মেয়ে যায়নাব সম্পর্কে জীবনীকার বলেন, তিনি আমার খালা-শাশুড়ি ছিলেন। সাত বছর আমি তাদের বাড়িতে রাত-দিন অবস্থান করেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর গলার আওয়াজ কখনো আমার কানে আসেনি। অথচ মাঝখানে শুধু বাঁশের বেড়া ছিল।

তার লজ্জা এতই প্রবল ছিল। এগার বছর পর্যন্ত তার সাথে আমার একটি কথাও হয়নি। কয়েক বছর আগে হযরতের জীবনের কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তার বড়বোনের মাধ্যমে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম; নিজের পিতার কিছু কথা আমাদেরকে শুনান, কিন্তু লজ্জার দরুণ তার মুখ থেকে এক শব্দও বের হয়নি।

শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই নয়, হযরত মুফতী ছাহেব স্বীয় স্ত্রীর পড়াশোনার ক্ষেত্রেও বেশ সজাগ ছিলেন এবং এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতেন। স্ত্রীর তালীমি বিষয়ে হযরত রাহ. নিজেই বলেন, তিনি যখন খুবই ছোট তখন আমি মকতবে কিছু বাচ্চাদের পড়াতাম। তার মধ্যে আমার আহলিয়াও ছিল। বিবাহের আগে কায়েদা থেকে কুরআন শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছি। অবশ্য বিবাহের পরে উর্দু কিতাব যেমন, রাহে নাজাত, যীনাতুন নিসা, হুকুকুল

ইসলাম, মিফতাহুল জান্নাত, বেহেশতী জেওর এগার খণ্ড এবং ফার্সী পহলী ইত্যাদি কিতাবগুলো পড়িয়েছি।
আরবীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্যে 'মুফীদুত তালেবীন' শুরু করেছি, কিন্তু ঘরোয়া বিভিন্ন ঝামেলা ও বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। অন্যথায় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের মত একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পড়াব। তারপর মাদরাসার দরসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়াতাম।
[তথ্যসূত্র: হায়াতে মুফতী আযম রাহ. (উর্দূ), লেখক মাওলানা মুফতী ইযহারুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম]

এসবকিছু লেখার এই উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা একজন আরেকজনের কাছে বলব আর তৃপ্তি পাব। বরং উদ্দেশ্য হল, উপদেশ গ্রহণ করা এবং তাঁদের উত্তম অবস্থাগুলো নিজের চলার পথের মশাল বানানো। হযরত রাহ.-এর পরিবারস্থ নারীরা আমাদের জন্য আদর্শ, নারী জাতির মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত।
তিনি তাদেরকে আরবী, ফার্সী, উর্দু, কুরআনের তাফসীর, ফিকহ কোনোটাই শিক্ষা দিতে বাদ রাখেননি।
নারী জাতির কত ঝামেলা-অজুহাত, একটু চিন্তা করি; তারাও তো আমাদের মতই নারী। অত কম বয়সে এতগুলো কিতাব পড়ে ফেলা খুব বেশি আগের কথাও নয়। তারা তো আমাদের দেশেরই নারী। আজ আমাদের মাঝে দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ খুবই কম। সাংসারিক ঝামেলায় পড়ে গেলে তো আর কথাই নেই। যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে তাঁদের জীবন কাহিনীতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে।
আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটু ভেবে দেখার তাওফীক দান করুন। আমীন

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/1299/]

## ইলম সম্মান অর্জনের উপায়

সবাই চায় দুনিয়াতে সম্মানের সাথে বসবাস করতে। পৃথিবীতে সম্মান দুই উপায়ে পাওয়া যায়। প্রথমত ধন-সম্পদের মাধ্যমে ; দ্বিতীয়ত ইলমের মাধ্যমে। তবে উভয়ের মাঝে

কতগুলো মৌলিক পার্থক্য আছে। ধন-সম্পদ যেমন অস্থায়ী ; এর মাধ্যমে পাওয়া সম্মানও অস্থায়ী। ইলম যেমন স্থায়ী ; এর মাধ্যমে পাওয়া সম্মানও স্থায়ী।

### ❒ ইলম ও ধন-সম্পদের মাঝে পার্থক্য

**এক.** ইলম আম্বিয়ায়ে কেরামের মিরাস আর ধন-সম্পদ ফেরাউন কারুনের মিরাস।
**দুই.** ইলমের মাধ্যমে মানুষের বন্ধু বাড়ে আর সম্পদের মাধ্যমে মানুষের শত্রু বাড়ে।
**তিন.** ইলম চুরি হওয়ার ভয় থাকে না। আর সম্পদ চুরি হওয়ার ভয় থাকে।
**চার.** ইলম হলো অন্তরের নূর যা সবসময় মানুষের সাথে থাকে; পক্ষান্তরে মাল থাকে থলেতে। সবসময় সাথে থাকে না।
**পাঁচ.** ইলম যত পুরানো হয়, গভীর হয়, সম্মান বাড়ে। পক্ষান্তরে মাল যত পুরানো হয়, তার মূল্যমান কমে। আজকের এক লক্ষ টাকা আর বিশ বছর আগের এক লক্ষ টাকা মূল্যমানে সমান নয়।
**ছয়.** ইলমের প্রতি আকর্ষণে মানুষ সম্মানী হয় আর মালের প্রতি আকর্ষণে মানুষ হয় কৃপণ।
**সাত.** ইলম যত বিলানো হয় তত বাড়ে আর মাল যত বিলানো হয় তত কমে।
**আট.** ইলমের মহব্বতে অন্তরে নূর আসে আর মালের মহব্বতে অন্তরে জুলুমাত আসে।
**নয়.** ইলম মানুষের হেফাজত করে আর মালের হেফাজত মানুষকে করতে হয়।
**দশ.** ইলম দিয়ে মানুষ মাল অর্জন করতে পারে, কিন্তু মাল দিয়ে কেউ ইলম অর্জন করতে পারে না।
**এগার.** মালের আধিক্যের কারণে ফেরাউল বলেছিল,

أَنا رَبُّكُمُ الاعْلٰى

'আমিই হলাম সবচেয়ে বড় খোদা' - সূরা নাযিয়াত ২৪

কারণ মাল মানুষকে অহংকারী করে তুলে। পক্ষান্তরে ইলমের আধিক্য মানুষকে করে বিনয়ী। তাই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ وَما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

'হে আল্লাহ, আমরা তোমার যথাযথ ইবাদত করতে পারি না, তোমাকে যথাযথ চিনিও না' - খুতুবাতে ফকীর খন্ড ৫

## ❒ ক্ষেত্রবিশেষ মাল অকার্যকর

সাধারণত লোকমুখে শোনা যায় টাকা হলে নাকি বাঘের চোখও মেলে। কথাটা সর্বতোভাবে ঠিক নয়। টাকা দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া গেলেও সবকিছু পাওয়া যায় না। দেখুন, তাহলে টাকা দিয়ে কি পাওয়া যায়,আর কি পাওয়া যায় না-

১. টাকা দিয়ে চোখ তো কেনা যায়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কেনা যায় না।
২. টাকা দিয়ে কিতাব তো কেনা যায়, কিন্তু ইলম কেনা যায় না।
৩. টাকা দিয়ে নরম বিছানা তো কেনা যায়, কিন্তু সুখনিদ্রা কেনা যায় না।
৪. টাকা দিয়ে সুন্দর জামা-কাপড় তো কেনা যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য- সৌন্দর্য কেনা যায় না।
৫. টাকা দিয়ে চাকর-বাকর তো কেনা যায়, কিন্তু সন্তান পাওয়া যায় না।
৬. টাকা দিয়ে ওষুধ তো কেনা যায়, কিন্তু সুস্থতা কেনা যায় না।
৭. টাকা দিয়ে কালো খেজাব তো কেনা যায়, কিন্তু যৌবন কেনা যায় না।
৮. টাকা দিয়ে মানুষের তোষামোদ তো পাওয়া যায়, কিন্তু আন্তরিক মহব্বত পাওয়া যায় না।
৯. দুনিয়াতেই মাল দিয়ে সবকিছু পাওয়া যায় না, আখিরাতে তো কিছুই কাজে আসবে না, একমাত্র দান-খয়রাত ছাড়া।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيم .

‘সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; তবে যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসবে’ -সূরা শুয়ারা ৮৮-৮৯

কুরআনের সাত জায়গায় সাতটা জিনিস সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো একটা আরেকটার সমান নয়। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, এর প্রতিটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলম আর বিপরীতটার উদ্দেশ্য হলো মূর্খতা।

আয়াত সাতটি হলো :

১.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে নবী! আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?'
-সূরা যুমার:৯

২.

قُلْ لا يَسْتَوِي الخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

'হে নবী! আপনি বলুন, ভালো আর মন্দ কি সমান?'
-সূরা মায়েদা:১০০

৩.

لا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الجَنَّةِ

' জান্নাতবাসী আর জাহান্নামবাসী সমান নয়'
-সূরা হাশর:২০

৪.

وَ ما يَسْتَوِي الاَعْمَىٰ وَالْبَصِيْرُ

'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এক নয়'
-সূরা ফাতির:১৯

৫.

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّورُ

'আলো ও অন্ধকার অভিন্ন নয়'
-সূরা ফাতির:২০

৬.

وَلَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ

'ছায়া ও রোদ্র এক নয়'
-সূরা ফাতির:২১

৭.

وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْواتُ

'জীবিত ও মৃত এক নয়'
-সূরা ফাতির:২২

## ইলম মোতাবেক জীবন গঠন

শব্দজ্ঞানের সম্পর্ক স্মৃতিশক্তির সাথে। শব্দজ্ঞানে  জীবন  খুব কমই গড়ে। জীবন গড়ে মূলত তত্ত্বজ্ঞানে বা নূরে ইলমে।  নূরে ইলমের সম্পর্ক দিলের সাথে । নূরে ইলম পাওয়া যায় আল্লাহওয়ালাদের কাছ থেকে। তাদের সোহবতে অন্তরে নূর আসে, সাকীনা ও প্রশান্তি আসে। মুরদা দিল জিন্দা হয়। এজন্যই বলা হয়:

عَلَيْكُمْ بِمُجالَسَةِ العُلَماءِ وَاِسْتِماعِ كَلامِ الْحُكَماءِ

'তোমরা আলেমদের মজলিশে বসো এবং বিজ্ঞজনদের কথা শোনো'

শব্দজ্ঞানে কিছু কথা শেখা যায়, কিন্তু আমল শেখা যায় না। আমলের জন্য জরুরী হলো দিলের ইসলাহ। আর দিলের ইসলাহের জন্য আল্লাহ-ওয়ালাদের সোহবতের বিকল্প নেই। ইলম বড় পবিত্র জিনিস, পবিত্র বর্তনেই তা দেয়া হয়। গোনাহের নাপাক থেকে দিল পাক করলে নূরে ইলম দিয়ে আল্লাহ তা ভরে দিবেন।

স্মরণ রাখা চাই, জবান চলে দেমাগের ইলমে আর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ চলে নূরে ইলমে। তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন হয় সেই নূরে ইলম।

## তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে কয়েকজন মনীষীর বয়ান

**শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক আকরুবী রহ. এর একটি বয়ান**-

মুহতারাম আসাতেযায়ে কেরাম ও প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত অসীম, যার শোকর আদায় করে আমরা শেষ করতে পারবো না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন:

وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوها

'তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গুণে শেষ করতে পারবে না'
-সূরা নাহল ১৮

আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন, শুধু তাই নয়, তালিবে ইলম বানিয়েছেন। ইলমের খাদেম বানিয়েছেন। পয়ঃনালা পরিষ্কার করার মেথর বানাতে পারতেন।

আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য পবিত্র জীবন, কুরআন-হাদীসের সাথে সম্পর্কিত জীবন দান করেছেন। আমাদেরকে উস্তাদের সামনে কুরআন-হাদীস নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসার তৌফিক দান করেছেন। এটা অনেক বড় সম্মানের বিষয়। দুনিয়ার কোনো শক্তিধর ব্যক্তি সম্মানের এই স্তরে পৌঁছতে পারবে না। এই সম্মাননা না আছে নেতৃত্বে, না মন্ত্রিত্বে ; না আছে জেনারেলিতে। দুনিয়ার তাবৎ নেয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ। বাদশাহি পেলে তো ফেরাউন, নমরূদের উত্তরাধিকার পেলে। মন্ত্রী হলে তো হামানের স্থলাভিষিক্ত হলে। সেনাপতি হলে তো রুস্তমের জানেশীন হলে। নবুওয়তের নিয়াবত তো পেলে না, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিস তো হলে না। এসকল পদ-পদবী কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়াবতের সমতুল্য হতে পারে না।

## দুনিয়ার নেতৃত্ব আমাদের চাই না

আমাদের না নেতৃত্বের খাহেশ আছে, নআ মন্ত্রিত্বের ; গাড়িবাড়ি আমাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলমের যে মহা সৌভাগ্য দান করেছেন, এতেই আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহর কসম! যদি দুনিয়ার তাবৎ নেয়ামত একপাশে রাখা হয় আর অন্য পাশে রাখা হয় ইলম, তাহলে নিশ্চিত যে, ইলমের পাল্লাই ভারী হবে। হাদীসের কিতাবের

মাঝে সিহাহ সিত্তাহর মাকাম, প্রতিটির স্তরবৈশিষ্ট্য, শর্ত-শরায়েত, উসুল ও বর্ণনারীতি সবিস্তারে তোমাদের আসাতেযায়ে কেরাম আলোচনা করবেন। আজ আমি দারুল উলূমের ইফতেতাহী দরস তিরমিযী শরীফ দিয়ে শুরু করবো। এটি পঞ্চম স্তরের কিতাব। এর আগে আছে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

একটা কথা মনে রেখো, আমাদের উলামায়ে কেরাম দেওবন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতিতে হাদীসের দরস দিয়ে থাকেন। বর্তমানে আসাতেযায়ে কেরাম তাদরীসে হাদীসের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ফায়দার বিষয়টি চূড়ান্ত লক্ষ্যে রাখেন। তাই তিরমিযী শরীফকে তারা বেছে নিয়েছেন মাসআলা-মাসায়েল ইস্তিম্বাত ও উসুল- জওয়াবেত নির্ধারণের উপাত্ত
রূপে।

কারণ, ইমাম তিরমিযী তার কিতাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের চেয়ে সহজ ও বিশদ বর্ণনারীতি অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী বরং ইরাকীদের জন্যও আলাদা বাব কায়েম করেছেন। বহু তরজমাতুল বাব কায়েম করে তার ওপর দলীল পেশ করেছেন। প্রতিটি মাসআলায় যে পরিমাণ ইখতেলাফ রয়েছে তার অধিকাংশ পাওয়া যায় তিরমিযী শরীফে।

এছাড়াও ইমাম তিরমিযী নিজের কাছে যে মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিরমিযী শরীফের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ছাড়াও অন্যান্য ইমামদের মতামত প্রমাণসহ পাওয়া যায়। তাছাড়া তিরমিযী শরীফে হাদীসের স্তরবিন্যাস তথা– হাসান, সহীহ, জয়ীফ ও ক্ববী স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে। তাতে দলীলের উপযুক্ততাও যাচাই হয়ে যায় অতি সহজে।

বিভিন্ন মাজহার বর্ণনা এবং প্রমাণসমূহের আধিক্যে তিরমিযী শরীফ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। ফলে এর মাধ্যমে ইলম অর্জন হয় সহজ। তিরমিযী শরীফে হাদীস শাস্ত্রের চৌদ্দটি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। সহজে বোঝা ও বোঝানোর ক্ষেত্রে কিতাবটি অতুলনীয়। যদিও সনদের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পূর্বোক্ত চার কিতাব সেরা, তবুও তিরমিযী শরীফের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে সহজকরণ ও বিশদকরণের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

এই দীর্ঘ আলোচনায় এ সন্দেহ নিশ্চয়ই নিরসন হয়েছে যে, বুখারী যেহেতু আসাহহুল কুতুব, তাই ইফতেতাহ এর মাধ্যমে করা উচিত। আশা করি কারো মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হবে না।

## উলামায়ে কেরামের পরিচয়

একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন,

رَحِمَ اللهُ خُلَفَئِيْ

'আল্লাহ যেন আমার প্রতিনিধিদের ওপর রহম করেন'

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রতিনিধি কারা?
জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আলেমগণ হলো আমার প্রতিনিধি।

তোমরা সবাই ঘর ছেড়েছো। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইলমের মর্যাদা দান করুন। সকলে যেন এই হাদীসের প্রতিপাদ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারো । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্বের অর্থ হলো, এ সকল মাদরাসা থেকে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে বরং পুরো পৃথিবীতে সে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া। এমনটা করা আদৌ উচিত নয় যে, একদিকে কুরআন-হাদীস শিখবে, অন্যদিকে নামায ছেড়ে দিবে বা ঝগড়াঝাঁটি করবে। শরীয়ত পরিপন্থী সকল প্রকার অশোভন ও গর্হিত কাজ থেকে আমাদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

আমাদের ওপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের হক অনেক। আমরা কবে আদায় করতে পারবো সেসব হক! তোমরা জানো, আল্লাহ আমাকে সারাজীবন হাদীসের খেদমতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন। আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, হাদীসের কোনো হক আমি আদায় করতে পারিনি। হয়ত হাজার বছর হায়াত পেলেও একসহস্রাংশ হকও আদায় করতে পারবো না। আমি গোনাহগার, সব দিক থেকে অযোগ্য।

তোমরা কাজীখান পড়ো, শামসে বাজেগা পড়ো,  এগুলো হলো ইলমের জন্য সহায়ক। আসল ইলম তো হল কুরআন-হাদীসের ইলম। বাড়িতে যদি গোসলখানা না থাকে বাড়িটা অসম্পূর্ণ থাকে।  তেমনি মানতেক ছাড়াও ইলমে হাদীসে গভীরতা আসে না। চিন্তা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অর্জিত হয় না।  ইলমে হাদীসের আরেকটি ফযীলত হলো,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের তালিবে ইলমের জন্য সদা সজীবতা, প্রফুল্লতা ও সচ্ছলতার দুয়া করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقالَتِيْ فَوَعَاها وَ حَفِظَهَا وَبَلَّغَها, فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

‘ আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে সদা প্রফুল্ল রাখুন যে আমার হাদীস শোনে, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রাখে এবং অন্যকে পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক সময় ফকীহের চেয়ে তার ছাত্র যোগ্য ফকীহ হয়ে থাকে' – তিরমিযী ২৬৫৮
কিন্তু এই সৌভাগ্য চূড়ান্ত আদব ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও ভালোবাসার দাবী এখানে প্রধান। যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ এখানে গৌণ। যেমন কিতাবের ওপর রুটি রাখা বেয়াদবি। কোনো কুতার্কিক যদি এমনটি করে আর তুমি বলো– ভাই, কিতাবের সঙ্গে বেয়াদবি করো না!  সে তোমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেবে। এখানে বেয়াদবির কী হলো! আমি তো নাপাক জিনিস রাখিনি। রুটি তো নাপাক নয়। আসল বিষয় হলো, আদব-শিষ্টাচার ও ভক্তি-ভালোবাসা; প্রাণহীন যুক্তিতর্ক নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। এক লোক তাকে অশোভন গালি দেওয়া শুরু করলো। তিনি মাথা নিচু করে চলে যেতে লাগলেন। কিন্তু লোকটা পিছু ছাড়লো না, ঘর পর্যন্ত এলো। ইমাম আবু হানিফা রহ. দরজার চৌকাঠে বসে বললেন, আচ্ছা ভাই, এবার যত খুশি গালি দাও! তোমার মন ভরলে তবেই উঠবো।
পরবর্তীতে নিজের গোলামের মাধ্যমে তার বাড়িতে এ বলে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাতেন যে, ভাই! তুমি আমার বড় উপকার করেছো। আমার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে আমার গোনাহ কমিয়ে দিয়েছো। এমন ঘটনা ইমাম যায়নুল আবেদীন সম্পর্কেও পাওয়া যায়।

একবার ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দরস চলাকালীন তারই এক ছাত্র বলে বসল, হাসান বসরীর ওপর আপনার এসব প্রশ্ন উত্থাপন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অনেক গালাগালির পর জারজ সন্তান বলেও গালি দিল। কিন্তু ধৈর্যের প্রতিমুর্তি ইমাম আবু হানিফা রহ. রাগ করলেন না। শুধু এতটুকু বললেন, আমাকে জারজ সন্তান বলা ঠিক হয়নি। আমার পিতামাতার বিয়ের সাক্ষী আজও বেঁচে আছেন; প্রয়োজনে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো।

- আংশিক :তালিবে ইলমের জীবন গঠন

**মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ হাফি.-এর বয়ান**

(তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা)

একটা কথা বলা জরুরি মনে করছি। এটা অবশ্য অনেকবার বলেছি। কিন্তু মুখাতাব যেহেতু পরিবর্তন হতে থাকে তাই হতে পারে যে, এখন যাদের বলছি তারা এক বারও শোনেনি। কথাটার উনওয়ান হচ্ছে তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা।

এখন ইলমের ময়দানে সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, তালিবে ইলম নিজেই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানে না এবং তালিবে ইলমের সমাজও তা জানে না। তালিবে ইলমের সমাজ তাকে অমর্যাদার চরমে নিয়ে গেছে। তালিবে ইলমের চোখেও নিজের মর্যাদা নেই, তার সমাজের চোখেও মর্যাদা নেই। তালিবে ইলম নিজেও তার শিক্ষককে সম্মান করে না। সমাজও মাদরাসার দ্বীনের শিক্ষককে মর্যাদা দেয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের যে মর্যাদা একজন দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষকের সে মর্যাদা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের যে মর্যাদা, একজন তালিবে ইলমের সে মর্যাদা নেই। এটা পদে পদে আমরা দেখতে পাই। সমাজের চোখে একটি স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটির যে মর্যাদা, একটি মাদরাসার সে মর্যাদা নেই। কার চোখে নেই? সমাজের চোখে নেই এবং মাদরাসায় যারা বসবাস করছে তাদের চোখেও নেই। তারাও পদে পদে মাদরাসাকে অসম্মান করে, মাদরাসার শিক্ষককে অসম্মান করে, ইলমকে অসম্মান করে। আর সমাজও তাই। এটাই হল এখন ইলমের সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক সমস্যা। যতদিন পর্যন্ত আমরা এই মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার না করতে পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

প্রথমে নিজের চোখেই নিজেকে মর্যাদা অর্জন করতে হবে। আমি যেন নিজেকে সম্মান করি, নিজের শিক্ষককে সম্মান করি। আমি যেন মাদরাসাকে সম্মান করি এবং ইলমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে সম্মান করি। যখন আমি নিজেকে সম্মান করতে শিখব

তখন ধীরে ধীরে আমার চারপাশের লোক আমাকে সম্মান করবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং মর্মান্তিক সমস্যা এটাই যে, আমার চোখে আমার মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। সমাজের চোখেও আমার মর্যাদা নেই। এটাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটা মাদরাসাতুল মদীনার একটি বিশিষ্ট চিন্তা। মাদরাসাতুল মাদীনা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এই জিনিসটাকে সামনে রেখেছে যে, নিজের চোখে নিজের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সমাজের চোখেও নিজেদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের ভেবে ভেবে চিহ্নিত করতে হবে যে, এই করলে নিজের কাছে নিজের মর্যাদা রক্ষা পায় এবং এই করলে সমাজের কাছেও মর্যাদা পাওয়া যায়। তো বিস্তারিত আলোচনার তো এখন সুযোগ নেই। এখন যে সমস্যাটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা নিয়ে কথা বলছি।

আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে এক পরিবারে একাধিক রকমের শিক্ষার প্রচলন আছে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে। একজন পড়ে মাদারাসায়। যে মাদরাসায় পড়ে সে নিজেকে ছোট মনে করে আর অন্যরাও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। কেউ করুণার চোখে দেখে। কেউ বলে যে, এটা বেকার! আবার কেউ করুণা করে বলে, তুই চিন্তা করিস না, তোর লাইগা আলাদা জমি রাইখা দিমু। মানে তুমি তো চলতে পারবে না। তাই সামনে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আমি করে যাব। আমি তো জুলুম করেছি তোমার উপর। তোমার ভাইকে কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর তোমাকে মাদরাসায় পড়িয়ে বেকার বানিয়েছি। তাই তুমি চিন্তা করো না। আমি আমার কবরের ফায়দার জন্য তোমাকে এই পথে পড়িয়েছি। তোমার দুনিয়ার চিন্তা আমি করে যাব। এটা কিন্তু করুণা, বাবার পক্ষ থেকে ভিক্ষা। ভাইও বলে, আমার ভাইকে মাদরাসায় দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমি এটা সামনে খেয়াল রাখব। আর কখনো করে অবজ্ঞা, অমর্যাদা।

তালিবে ইলম নিজেও নিজেকে অমর্যাদা করে। আগে তুমি নিজের চোখে মর্যাদা অর্জন কর। নিজেকে তুমি মর্যাদাবান ও সম্মানিত মনে করার চেষ্টা কর। তুমি ভাব যে, আমি এই পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মর্যাদাবান সদস্য। কারণ এই পরিবারের পক্ষ থেকে একমাত্র তালিবে ইলম আমি। সুতরাং আমার মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি।

এখন মর্যাদা দুই রকম। একটা হল তোমার চোখে মর্যাদা আরেকটা হল অন্যের কাছে মর্যাদা দাবি করা। অন্যের কাছে মর্যাদা দাবি করলে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। অতএব অন্যের কাছে মর্যাদা দাবি করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যেন নিজেকে মর্যাদা দেই। অর্থাৎ আমি আমার পরিবারের সামনে এমন কোনো কাজ করব না, যাতে আমার পরিবার বলতে

পারে, মাদরাসায় পড়ে কী লাভ হল? আমার পরিচয়ের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ কোনো কাজ আমি করব না। একজন কলেজের ছাত্র স্কুলের ছাত্র যে কাজ করতে পারে, আমি তা পারি না। কারণ আমার আলাদা মর্যাদা আছে।

আমি নিজের মর্যাদাটা নিজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করি। এর জন্য কী কী করণীয় তা তুমি ভেবে দেখ। আল্লাহর যে আদেশ আছে তা মজবুতীর সাথে পালন কর। আল্লাহর যে নিষেধ আছে সেগুলো থেকে মজবুতীর সাথে বেঁচে থাক। তোমার পরিবারের কেউ যেন তোমাকে এমন বিবাহে নিতে না পারে যেখানে দ্বীনের খেলাফ কাজ হচ্ছে। বিনয়ের সাথে বলে দাও, আপনারা যান, আমি যাব না। যাব না তো যাবই না।

আমি একটা কথা বলি, নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা! ভদ্রতার সাথে বল যে, আমার পক্ষে সম্ভব না, আমার আল্লাহ নারায হবেন। ওখানে বেপর্দা হবে, পর্দাপুশিদা রক্ষা হবে না। যেখানে পর্দা রক্ষা হয় না, সেখানে আমি যাব না। এই শব্দগুলি পরিবারের কাছে অপরিচিত। এই শব্দগুলো যখন বলবে তখনই তোমার পরিবার হোঁচট খাবে। কিন্তু এটা তুমি বলতে পারবে কখন? যখন তুমি নিজে পর্দা রক্ষা করে চলবে। আর নয় তোমাকে নিয়ে মানুষ মশকরা করবে। এটা গেল একটা বিষয়।

এখন যে সমস্যাটা নিয়ে আমি খুব পেরেশান, সেটা তোমাদেরকে বলছি। যে কোনো অনুষ্ঠানে সময় নির্ধারণ করা হয় পরিবারের বা প্রতিষ্ঠানের বা এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রেখে। এলাকায় একটা জনসভা হবে। অমুক মন্ত্রীকে দাওয়াত দিতে হবে। মন্ত্রীকে গিয়ে কেউ একথা বলার সাহস পাবে না যে, অমুক তারিখে আমি সভা নির্ধারণ করেছি আপনাকে আসতে হবে। প্রথমে ছুটে যাবে মন্ত্রীর কাছে যে, আপনার কবে সময় আছে? কারণ মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার সুবিধা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করা হবে। তো আমাকে যদি কেউ কোনো অনুষ্ঠানে শরীক করতে চায় তাহলে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে আমার কাছ থেকে সময় নিবে। আমরা একটা অনুষ্ঠান করতে চাই, আপনাকেও সেখানে রাখতে চাই, আপনি আসবেন তো? আপনি আপনার সময়মতো ও সুযোগমতো একটা তারিখ দেন। তখন কী হবে? আমি তারিখ দিব এবং সে অনুযায়ী অনুষ্ঠানটা হবে। যেহেতু আামি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আর আমি যদি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করি তাহলে মানুষ আমাকে গুরুত্ব দেবে কেন? তো আমরা একথাটা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে, একটা পরিবারে তালিবে ইলম হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পুরো পরিবার ওই তালিবে ইলমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। স্কুলে কিন্তু তাই হয়। মায়ের বেড়ানো, বাবার বেড়ানো, পরিবারের বেড়ানো সবকিছু ওদের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে হয়। একটা ঘটনা তুমি আমাকে দেখাও যে, আমাদের দেশে কোনো

একটা ছেলের এসএসসি পরীক্ষার সময় সেই পরিবারে বিয়ে হয়েছে। একটা ঘটনা দেখাও যে, ছেলের স্কুল বন্ধ করে ছেলেকে কক্সবাজার বেড়াতে নিয়ে গেছে।

গত দুই তিন বছর আগের ঘটনা। আমার একজন আত্মীয় তার পরিবারের সমস্ত বোনেরা একত্র হবে মায়ের বাড়িতে। তো একজনকে যখন বলা হল তখন সে বলল, আমি তো আসতে পারব না। আমার ছেলের স্কুল বন্ধ হবে আরো পনেরো দিন পর। তাই আমি এখন আসতে পারব না। মায়ের সবকিছু চলে তার ছেলের কখন বন্ধ হবে, কখন খোলা হবে এর উপর। শুধু ব্যতিক্রম হল মাদরাসা। মাদরাসার তালিবে ইলম যে পরিবারের সদস্য, সে পরিবার আগে সময় নির্ধারণ করে এরপর মাদরাসায় এসে বলে, ছেলেকে ছুটি দেন। ছেলে হয়ে গেল অনুষ্ঠানের তাবে। হওয়া দরকার ছিল একেবারে বিপরীত। আমরা এই বিবাহের অনুষ্ঠান করতে চাই তো আমার ছেলের ক্যালেন্ডার দেখি। তার সময় আছে কবে? অমুক শুক্রবারে সময় আছে তাহলে ঐ শুক্রবারে অনুষ্ঠানটা কর। কিংবা কুরবানীর পর এতদিনের ছুটি আছে। তখন অনুষ্ঠানটা কর। কারণ আমার ছেলের তো থাকতে হবে। আর সে থাকবে তার সুবিধামতো, আমাদের সুবিধামতো নয়।

পরিবার যদি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করে আর তুমি যদি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে কর তাহলে তুমি তোমার পরিবারকে বলবে যে, আমাকে যদি এই অনুষ্ঠানে রাখতে হয় তাহলে তো অনুষ্ঠানটা আমার সুবিধামতো করতে হবে। তবে বিরোধে যাব না। ঠিক আছে, আপনারা যদি মনে করেন যে, আপনাদের কোনো সমস্যা আছে, এজন্য অমুক তারিখে আপনাদের করতে হবে, তাহলে ঠিক আছে, আপনারা করে ফেলেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি থাকতে পারব না। কিন্তু তৃতীয় সুরত যে, তোমার সুবিধামতোও করবে না এবং তোমার অনুপস্থিতিও মানা হবে না; বরং তাদের সুবিধামতো তোমার কাজ ফেলে তোমাকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে, এর চেয়ে অমর্যাদা, এর চেয়ে বে-ইযযতী ও যিল্লতী আর হতে পারে না। এটা তো তুমি মানতে পার না। যদি মান তাহলে বুঝতে হবে তোমার নিজের চোখে তোমার মর্যাদা নেই এবং লিখে নিতে পার যে, তোমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এটা কোনো হালকা বিষয় নয়। এটার রেশ অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। তোমার পরিবার ইলম থেকে মাহরূম হয়ে যেতে পারে এবং এর অনেক নযীর আছে। পরিবার যদি তার তালিবে ইলমকে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী মনে না করে এবং সেরকম মর্যাদার আচরণ না করে তাহলে সে পরিবারে ইলম নাও আসতে পারে। না আসার যথেষ্ট আশংকা আছে। এটা পরিবারের নিজের প্রয়োজনে ভাবতে হবে। কারণ পরিবার একটা ছেলেকে, একটা ছেলের ভবিষ্যতকে ইলমের জন্য কুরবান করে দিচ্ছে। সুতরাং ওই পরিবারেরও প্রয়োজন আছে ইলম থেকে যেন মাহরূম না হয়।

তুমি যদি নিজেকে তালিবে ইলম হিসাবে মর্যাদা না দাও তাহলে ফেরেশতারা তোমার জন্য দুআ করবে, সমুদ্রের মাছেরা তোমার জন্য দুআ করবে-এটা কী হতে পারে? ওই তালিবে ইলমের জন্যই দুআ করবে, যে তালিবে ইলম নিজেকে মর্যাদা দেয়। এজন্য আমরা আগে থেকেই সবাইকে সতর্ক করে দেই। এখানে যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমাকে এই আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে এবং তোমার পরিবারকেও উপলব্ধি করতে হবে। তবে বিরোধে যাবে না। কোনো অন্যায় কাজে যদি তোমার পরিবার তোমাকে শরীক করতে চায় তুমি নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা বজায় রাখবে। তুমি ভদ্রতার সাথে বল, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি আমার আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করতে পারি না। আমার আল্লাহ নারায হবেন। তোমার বাবা যদি বলেন, সামাজিকতায় খারাপ দেখা যায়। তোমাকে যেতেই হবে। তো আপনি আব্বা একটু লিখে দেন যে, এতে যদি কোনো গুনাহ হয় তার দায়িত্ব আপনার। কিয়ামতের দিন আপনি আল্লাহর কাছে এর জবাব দিবেন। আপনি লিখে দিলে আমি যাব। লিখেও দিবে না, যেতেও হবে-এটা তো হয় না। এটা অযৌক্তিক কথা। আমি বাবা হিসাবে এতটুকু সম্মান তো আপনাকে করছি যে, আপনি এটার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমি যাব। নমনীয়তার সাথে অমনমনীয়তা বজায় রাখ। ঘরে যদি টেলিভিশন থাকে, যাতে নাচ-গান হতে থাকে তাহলে তুমি নমনীয়তার সাথে অনমনীয়তা প্রদর্শন কর। এ কামরায় তুমি কখনো প্রবেশ করো না। অভদ্রতা করবে না, রুক্ষতা করবে না। তবে নিজের আদর্শের উপর অটল থাকবে। পক্ষান্তরে তুমি নিজেই যদি আমার কাছে এসে বল, হুযুর দয়া করে আমাকে দুই দিন ছুটি দেন, আমার ভাইয়ের বিয়ে। তখন তো আমার কলিজায় আঘাত লাগে বাজান। আমাদের কাগজে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, এরকম ছুটি চাওয়াও অপরাধ। এসব ক্ষেত্রে ছেলের সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে হবে।

এ বছরের শুরুতে এক ছেলের সম্ভবত নানা এসে বলছে যে, ছুটি দিতে হবে বিয়েতে। আমরা ছুটি দেইনি। শেষে বলেছে, তাহলে তো আমরা আর ছেলেকে রাখতে পারব না। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। আমি তো শুরুতেই বলেছি যে, এই মাদরাসায় সবাইকে ভর্তি করা ঠিক না। আপনি ছেলেকে নিয়ে যান। অন্যস্থানে ভর্তি করান। আমার কোনো আপত্তি নেই এবং আমি তাতে খুশি। তোমার কাছে যদি এটাকে সমস্যা মনে হয় তাহলে তোমার এমন মাদরাসায় ভর্তি হওয়া উচিত যেখানে তুমি এ রকমের সমস্যায় পড়বে না। কিন্তু এখানে পড়বে এবং এখানের অসম্মান করবে তাহলে তো তুমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নযীরও আছে।

আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়। সে এই মাদরাসায় নিজের ছেলেকে ভর্তি করেছে। এরপর বিয়ের জন্য ছুটি দিতে হবে। আমি ছুটি দেইনি। ছেলেকে নিয়ে গেছে। আমি বলেছি, ঠিক আছে। নিয়ে যান। এটা ভালো। অন্য মাদরাসায় ভর্তি করান। বাইতুস সালাম মাদরাসায় ভর্তি করেছে, লেখাপড়া করেছে। কিন্তু তুমি যদি এখানে পড়তে চাও তাহলে তোমাকে এখানের সম্মান করতে হবে এবং এর দ্বারা তুমি লাভবান হবে।

অনেক দূরের কথা চিন্তা করে আমি এ কথাগুলো বলছি যে, আমাদের সমাজে ইলমের, তালিবে ইলমের এবং মাদরাসার কোনো মর্যাদা নেই। এটা আমাদেরকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আর তা শুধু মুখের কথায় হয়ে যাবে না। নিজের যোগ্যতা দ্বারা, ব্যক্তিত্ব ও আচার আচরণ দ্বারা তা উদ্ধার করতে হবে। তোমাকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তোমার এই যোগ্যতা থাকতে হবে যে, তোমার পরিবারের যারা স্কুল-কলেজে পড়ে তাদের বলতে পার, তুমি কী বাংলা পড়! তোমার স্কুলে কী বাংলা পড়ায় আসো দেখি তোমার সাথে বাংলায় কথা বলি, তুমি বাংলা কতটুকু জান, আমি কতটুকু জানি দেখি।

আল্লাহ যদি তাওফীক দেন আমাদের তো যথেষ্ট সুযোগ আছে, যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আমরা ওদের প্রতিটা পড়ার বিষয়কে নিজেদের বিষয় বানিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আগে তো গোড়া মজবুত করতে হবে। গোড়াই তো মযুবত হচ্ছে না। এখনো তো আমরা নিজেদেরকে চিনতেই শিখিনি। তাই ওঝা না হয়েই যদি সাপ ধরতে যাও তাহলে তো পদে পদে ছোবল খাবে। আমাদের তো ইচ্ছা আছে সব সাপ-অংকের সাপ, বিজ্ঞানের সাপ, ভূগোলের সাপ সব আমাদের ঝাঁপিতে ভরব। ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আগে তো ওঝা হতে হবে। এখনো তো মন্ত্র শিখিনি বাজান! ছোবল খাব কেন? যাই হোক এটা অন্য বিষয়। তো গত রাতে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের বাবা ফোন করে বলছে যে, আমরা ছেলের বিয়ের তারিখ করে ফেলেছি। এখন ও ছোট ছেলে। ওকে আসতে হবে। আমি বললাম, ভাই! সংক্ষেপ কথা হল, আপনার এ ছেলে যে বর্ষে পড়ে কয়েকদিন আগে সে বর্ষের এক ছেলেকে আমরা এই কারণে বিদায় করে দিয়েছি। এখন তাকে কীভাবে ছুটি দেই? কিন্তু তার এক কথা-ছুটি দিতে হবে। নাহলে বিয়েটা ভেঙ্গে যাবে। আমি বললাম, বিয়ে ভেঙ্গে যাবে কেন? আপনারা আপনাদের কাজ করে ফেলেন। ছেলে এখানে লেখাপড়া করতে থাকুক। আমরা আপনাদের জন্য দুআ করি। বিয়ে ভাঙ্গবে কেন? আর যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার ছেলের অনুপস্থিতিতে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে এত গুরুত্বপূর্ণ আপনার ছেলে তাহলে তার সুবিধামতো তারিখ করেননি কেন? কোনো জওয়াব নেই। না হুযুর! একটু ছুটি দেন। আরে ছুটি দিলে তো আপনার ছেলের ক্ষতি হবে। না হুযুর, দয়া করে একটু ছুটি দেন। আরে দয়া করেই তো ছুটি দিচ্ছি না। নির্দয় হলে তো ছুটি দিয়ে দিতাম। যে

ছাত্রের বিষয়ে আমি নির্দয় হয়েছিলাম তার ফলাফল আমার সামনে আছে। ওরা বলেছিল দয়া করেন আমি নির্দয় হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ ছেলে এখনো জীবিত আছে। এখন আমি যদি তোমাকে ছুটি দেই তাহলে তোমার প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা হবে। তোমার পরিবার হয়তো জানে না, না জেনে তো মানুষ কত অন্যায় করে। না জেনে তো মাও ছেলেকে বিষ খাইয়ে দেয়। ওষুধ মনে করে। কিন্তু আমি তো জানি তোমার কত বড় ক্ষতি হবে। এ তো চরম অমর্যাদা তোমার পরিবার তোমাকে করবে, তুমি তোমার মাদরাসাকে করবে, এটার তো ফল আছে। এরপর ঐ ছেলে নিজে এসে চোখের পানি ফেলছে। হুযুর, দয়া করে আমাকে দুই দিনের ছুটি দেন। আমি প্রথমে শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমি সব বোঝাচ্ছি সে আমার পায়ে ধরে বলে হুযুর, দুই দিনের ছুটি দেন। তখন আমার ...। আমি আসলে তার কাছে মাফ চাচ্ছি। আমার আরো সংযম রক্ষা করা দরকার ছিল। আমি তাকে ধমক দিয়েছি-তোমার সাহস হল কীভাবে আমার কাছে তুমি ছুটি চাইতে এসেছ। তুমি না তোমার পরিবারকে বলবে যে, আপনারা বিয়েটা করে ফেলেন। বিয়ে ভেঙ্গে যাবে এটা খামাখা কথা। এটা কেমন কথা যে, ঐ ছেলে না থাকলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে? এটা হল অপ্রয়োজনীয় ...।

যাই হোক, বাবা, নিজের মর্যাদা নিজে বুঝতে চেষ্টা কর এবং নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। অন্যকে বোঝাও আমাকে যদি কোনো অনুষ্ঠানে সঙ্গে রাখতে হয় তাহলে আমার ক্যালেন্ডার আছে। আমি কোনো ফালতু মানুষ নই। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই এ কথাটা বলতে পারে যে, আমার আলাদা ক্যালেন্ডার আছে, আলাদা সময়সুচি আছে। তুমি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তোমার পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাকি সমাজ যেহেতু তোমাকে মর্যাদা দিচ্ছে না তাই নমনীয়তার সাথে অনমনীয় হও। বিরোধে যেও না। সমাজকে অনুমতি দিয়ে দাও যে, আমার অনুপস্থিতিতে সবকিছু করে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে-এটা ঠিক না। হ্যাঁ, কখনো কখনো তোমার এতে ক্ষতি হতে পারে। কখনো সুনামের ক্ষতি হতে পারে। ঐ ক্ষতিগুলোকে তুমি তোমার ইলমের যাকাত মনে করে আদায় কর, আর দেখ, আল্লাহ তাআলা কেমন উন্নতি দান করেন। হতে পারে, এই বিয়েতে শরিক না হওয়ার কারণে তোমার ভাই নারায হয়ে গেল। ঐ নারাযিকে তুমি কবুল করে নাও। বাকি ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃত্ব রক্ষা কর। ঐ নারাযি একদিন দূর হয়ে যাবে। আর যদি দূর না হয় তাহলে তুমি তোমার আজর পেয়ে যাবে।

আমাকে একজন বলেছিল যে, আমার ভাই তো আমার খরচ দেয়। আমি না গেলে আমার খরচ বন্ধ করে দিবে। আমি বললাম, ছিঃ। তুমি তালিবে ইলম, তোমার খরচ কে বন্ধ করবে? তোমার খরচ তো আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা দেবেন। তুমি করে দেখ। ঠিকই

সে বিয়েতে গেল না। কোনো সমস্যা হয়নি। শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আর সমস্যা হলে আল্লাহ তাআলা নতুন রাস্তা খুলে দিবেন। আমি বলতে চাই যে, কারোর মৃত্যুতেও আমার ছুটি না নেওয়া উচিত। ছুটি নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। এটা আমার কথা নয় আমার বড়দের কথা। তোমার দাদার ইন্তেকাল হয়েছে। তুমি এখান থেকে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড় এবং তার জন্য দুআ কর। সবাইকে নিয়ে দুআ কর। আমাদের এখানে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। ছেলে যায়নি। আমরা সবাই মিলে তার জন্য দুআ করেছি। ঐ মরহুমের এখনো তো দুআ দরকার। তোমার উপস্থিতি তার দরকার নেই। তোমার উপস্থিতি তার হায়াত ফিরিয়ে আনবে না। কিন্তু তোমার ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে। এগুলো এখন কেউ বোঝে না। আমার কথাগুলি আমার কাছের মানুষও বোঝে না, দূরের মানুষও বোঝে না। আল্লাহর কাছে রাস্তার অভাব? যার জন্য সমুদ্রের তলদেশের মাছ দুআ করে তার রিযিক বন্ধ হবে কীভাবে? আর যদি এ রকমই হয় তাহলে মাদরাসা ছেড়ে দাও। ইলমওয়ালা যার দায়িত্ব নেবে না এমন ইলম পড়বে কেন?

মোটকথা, নিজের মর্যাদাকে কখনো ভূলুণ্ঠিত করবে না। ইলমকে, মাদরাসাকে মর্যাদা দাও। নমনীয়তার সঙ্গে অনমনীয়তা বজায় রাখ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। এ কথাটা যেন আর বারবার আমাকে না বলতে হয় বাবা! কিন্তু কী করব? কেউ যেন আমার কথা বোঝে না বলে মনে হয়।

## মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ-এর আরো একটি বয়ান

এই যমানায় দ্বীন শেখার জন্য মাদরাসায় আসা বিরাট বড় কুরবানী। এত বড় কোরবানীর পর কোনো তালিবুল ইলমের মাহরূম হওয়ার কথা নয়। যে যমানায় দ্বীনী ইলমের কোনো কদর নেই, না পরিবারে, না সমাজে তখন যদি কোনো একজন মানুষ ইলমের জন্য আগ্রহী হয় এবং তা গ্রহণ করতে চায় তার তো মাহরূম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ বাস্তবতা এই যে, ইলমের তলবে এসেও অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে মাহরূম হয়ে যাচ্ছে। কী এর কারণ? কেন সে মাহরূম হচ্ছে? সে দুনিয়াও ছেড়ে দিল, আবার ইলম থেকেও মাহরূম হল। এর চে’ মর্মান্তিক বিষয় আর কী হতে পারে?

যে যমানায় সামান্য মেহনতের অনেক আজর দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তখন মানুষ কেন ইলম থেকে মাহরূম হয় তা চিন্তা করা দরকার। আমাদের পূর্ববর্তীগণ এর কারণগুলো সাফ সাফ বলে গিয়েছেন। এক দল তো মাহরূম হচ্ছে এই কারণে যে, তারা ইলম তলবই করেনি। তারা ইলম থেকে এমন মাহরূম হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের মানুষ এমন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, যা আমাদের মাদরাসার ছোট একজন তালিবুল ইলম শুনলেও হেসে দেবে। অথচ সেটিই তার কাছে বিরাট বিষয়। কারণ সে যিন্দেগীতে দ্বীনের একটি মাসআলাও শিখেনি। কিন্তু এই অল্প ক'জন মানুষ, যাদের ইলম তলব করার সুযোগ হয়েছে তারা কেন মাহরূম হচ্ছে? এর কারণগুলো জানা দরকার এবং সেগুলো থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

কিছু কারণ এমন আছে, যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন গিযা (পানাহার) হালাল হওয়া। দ্বীনী ইলম হাসিল হওয়ার জন্য এটি একেবারে অপরিহার্য। অথচ তা তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণে নেই। তালিবুল ইলমের ভরণ-পোষণ যারা করে তাদের অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে অথচ মাসআলা জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না। কোন কারবার হালাল, কোন কারবার হারাম, অনেকেরই তা জানা নেই।

অনেকে তো জেনে শুনেও হারাম পন্থা অবলম্বন করছে। অনেকে বলে যে, এই যমানায় এত বাছ বিচার করে চলা সম্ভব নয়। তাহলে আর সংসার চালানো যাবে না। তবে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা হালাল হারাম বেছে চলার জন্য আমাদের চেয়েও বেশি ফিকির করছে।

তো কোনো অভিভাবক যদি হারাম পথে উপার্জিত অর্থ তালিবুল ইলমের পিছনে ব্যয় করে আর তালিবুল ইলম তা ভোগ করে এবং তা দিয়ে তার শরীরের রক্ত-মাংস তৈরি হয় তাহলে চিরতরে তার ইলমের দরজা বন্ধ। সারা জীবন মাদরাসায় পড়ে থাকলেও তার ইলম হাসিল হবে না। এজন্য তাকে খোঁজখবর নিয়ে জানতে হবে, অভিভাবকের উপার্জন হালাল কি না। হালাল বলে নিশ্চিত হলে সে তা ব্যবহার করবে। আর হারাম হলে এর থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর একটি ছুরত হল কোনোরকম জানটা বাঁচে-এ পরিমাণ গ্রহণ করা, এর বেশি গ্রহণ না করা। তারা দিতে চাইলেও তালিবে ইলমের কর্তব্য– গ্রহণ না করা।

কিন্তু  আমাদের অনেক তালিবুল ইলমের অবস্থা তো এই যে, তার ভাই ও আত্মীয়-স্বজন হারাম উপার্জন করে, ব্যাংকে চাকরি করে, সুদি লেনদেন করে এ কথা জেনেও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যায়, হারাম থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টাই করে না। অথচ যারা হারাম উপার্জন করে বলে জানা আছে, তালিবুল ইলম তাদের বাড়িতে যেতে পারে না, তাদের বাড়ি থেকে কিছু খেতে পারে না। নতুবা ইলম থেকে মাহরূম হতে হবে। তবে আপনার উপার্জন হারাম, এই জন্য আপনারটা খাবো না-একথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথম কাজ নিজে হারাম থেকে বেঁচে থাকা। যেখানে যেখানে হারাম গিযার সামান্য গন্ধ আছে তালিবুল ইলমের উচিত সেখান থেকে দূরে থাকা। তবে এমনভাবে যাতে ফেতনা না হয়। তাদের বিয়ে-শাদীতে না যাওয়া, তাদের হাদিয়া-তোহফার বিষয়ে সাবধান থাকা, ফিরিয়ে দিলে যদি ফেতনা হয় তাহলে রেখে দিবে, কিন্তু নিজেরা খাবে না, অন্তত নিজে খাবে না। গরীবকে দিয়ে দিবে।

বাবার উপার্জন হারাম হলে কোনো রকম জান বাঁচে-এ পরিমাণ গ্রহণ করবে। আর ইসতেগফার করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যে, আল্লাহ! আমার জন্য হালাল গিযার ব্যবস্থা করে দাও। আমার ইলমের পথের এই বাধা দূর করে দাও। আর যা উপায়হীন অবস্থায় গ্রহণ করছি আমার জন্য তা হালাল করে দাও। বাবার জন্য দোয়া করবে যে, আল্লাহ তুমি তাঁকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে আন এবং হালাল উপার্জনের তাওফীক দাও। এভাবে ভিতরে যদি তড়প ও অস্থিরতা আসে তাহলে আল্লাহ তাআলা অন্তত তার জন্য ঐ গিযাটা হালাল করে দিবেন। তারপর মা বাবাকে জানানো দরকার যে, সন্তানের ইলমের জন্য পিতামাতার হালাল-হারাম বেছে চলা জরুরি। যে ঘরের উপার্জন হালাল নয় সে ঘরে ইলম আসে না। সন্তানকে মাদরাসায় দিলেও তার যিন্দেগী কামিয়াব হয় না। না দুনিয়াতে, না আখিরাতে।

বহু ছেলে এভাবে বরবাদ হচ্ছে। কেউ কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে না। আমার মনে হয়, এর মূল কারণ হল, হারাম গিযা। থানভী রাহ. বলেছেন মাদরাসায় কোনো তালিবুল ইলমকে দাখেল করার সময় খবর নাও যে, অভিভাবকের উপার্জন হালাল কি না। আমরা তো খবর নেই না, এমনকি এই প্রশ্নটাও করি না যে, আপনি কী চাকরি করেন, আপনার আয় কত? আপনার অন্যান্য উপার্জন কী? আমি একটা ভর্তি ফরম তৈরি করেছিলাম যাতে এই সব প্রশ্ন ছিল। কিন্তু তা চালু করতে পারিনি। আমার সঙ্গীরা বলল, এতে ফেতনা হবে। কিন্তু কী লাভ হয়েছে! যারা মাহরূম হওয়ার তারা তো মাহরূম হচ্ছেই। অনেক ছেলেকে দেখি, সুন্দর লেখাপড়া করছে, হঠাৎ বলে যে, আমার লেখাপড়া করতে মন চায় না। পালিয়ে যায়। কোনো

মারধর করা হয় না। আদর আপ্যায়নের সাথে পড়ানো হয়। পালিয়ে যাওয়ার বাহ্যিক কোনো কারণ নেই। তবুও পালিয়ে যায়। আমরা এর কারণ তলিয়ে দেখি না। এর প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল হারাম গিযা।

এই হারাম গিযা থেকে তালিবুল ইলমের বাঁচার উপায় হল একেবারে যতটুকু না নিলে নয়, ততটুকু নেবে। অতিরিক্ত নেবে না। দিতে চাইলেও এই বলে ফিরিয়ে দেবে যে, আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, জোর করে আরো বেশি আদায় করার চেষ্টা করে। অথচ এই অতিরিক্ত খরচটা তার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। এটা খুব নাযুক এবং স্পর্শকাতর বিষয়, কিন্তু না বলে তো উপায় নেই। অভিভাবকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে কথা হয় তাদেরকে বলা দরকার যে, আপনার উপার্জন হালাল করার চেষ্টা করুন। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে ছেলেকে মাদরাসায় দেবেন না। দিলে ছেলের ইলম শিক্ষা হবে না। দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে।

কাবা ঘর নির্মাণের সময় কাফের-মুশরিকরা পর্যন্ত হালাল উপার্জন দ্বারা আল্লাহর ঘর নির্মাণ করার চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছিল আল্লাহর ঘর নির্মাণের সময় হারাম মাল ব্যবহার করলে আল্লাহর কাছে রেহাই পাব না। হালাল উপার্জন দ্বারা নির্মাণের চেষ্টা করেছিল বলেই একটি অংশ তারা নির্মাণ করতে পারেনি, ছোট করে নির্মাণ করতে হয়েছে।

এখন মুসলমানদের দেশে সরকারী পয়সা ব্যয় করে স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে। সরকারী পয়সায় হালাল হারামের কোনো বাছ-বিচার নেই। প্রকাশ্যে হারাম রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা হচ্ছে। সুতরাং ঐ সকল স্থান থেকে যারা লেখাপড়া করে বের হবে তারা কিছু শব্দ ও বাক্য শিখতে পারে, কিন্তু মানুষ হতে পারে না। কাফেরদের দেশে হবে, কিন্তু মুসলমানদের সন্তান হারাম পয়সায় লেখাপড়া করে মানুষ হবে না। এই জন্য মাদারেসে কাওমিয়্যা সব সময় সরকারী সাহায্য থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে।

একইভাবে ব্যক্তিগতভাবে যাদের ঘরে হারাম উপার্জন হয় তাদের ঘরে ইলম আসার কথা নয়। হাঁ, ঘরে হারাম উপার্জন হওয়া সত্ত্বেও তালিবুল ইলম যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা হিফাযত করবেন। বেঁচে থাকার উপায় কী? যতটুকু না খেলে আমি বাঁচতে পারব না, যতটুকু কাপড় না হলে আমার সতর ঢাকবে না, এ পরিমাণ নেওয়া,

এর বেশি না নেওয়া। আর হারাম উপার্জনকারী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে না খাওয়া এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ না করা।

ইলম থেকে মাহরূমীর দ্বিতীয় কারণ হল বাড়িতে আল্লাহর নাফরমানী হওয়া। যে বাড়িতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হয়, নাচ গান হয়, পর্দা-পুশিদা নেই, মা পর্দা করে না, বোন পর্দা করে না, বাবা পর্দা করে না সে বাড়িতে ইলম আসবে না। এগুলোর উপর যদিও তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই তবুও এগুলো তার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার অনেক বড় কারণ। এটা থেকে সে বাঁচবে কীভাবে? সে নিজে পর্দা করবে।

এই মাদরাসার একজন তালিবুল ইলমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাবী আছে? সে বলল, আছে। ভাবীর সাথে দেখা দাও? বলল, জ্বী। ভাবীর সাথে পর্দা করা যে জরুরি তাকি জানো? বলল, না। তোমার আব্বা কোথায়? বলল, হজ্বে গেছেন। হজ্ব থেকে আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

তার পিতা এলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি ঘরে ভাবীর সাথে পর্দা করে? তিনি বলেন কি, এক ছাদের নিচে থাকলে পর্দা করা কি সম্ভব? আমি বললাম, আপনি যদি ঘরে পর্দা রক্ষা করতে না পারেন তাহলে আপনার ছেলের ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার আশঙ্কা আছে। কোনো গুরুত্ব দিল না। এমনকি ছেলেটাও না। এরপর বছরখানেকের মধ্যেই লেখাপড়া থেকে তার মন উঠে গেল। সে আর পড়ল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়িতে পর্দা না থাকার কারণে ছেলেটা ইলম থেকে মাহরূম হল।

এজন্য তালিবুল ইলমের বাবা-মার উচিত পর্দা করা, তালিবুল ইলম চেষ্টা করে যদি বাড়িতে পর্দা না আনতে পারে তাহলে অন্তত নিজের পর্দাটা রক্ষা করা কর্তব্য। যাদের সাথে পর্দা করা জরুরি সে যদি তাদের সাথে পর্দা করে তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে ইলম দান করবেন, তাকে মাহরূম করবেন না। বাড়িতে নাচগানের ব্যবস্থা আছে কিনা সে ঐগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন।

আর এখন তো তালিবুল ইলম-আল্লাহ তাআলা হিফাযত করুন-নিজেই মাদরাসায় নাচগানের ব্যবস্থা করে নেয়। মাদরাসায় যন্ত্র নিয়ে আসে! ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার এর চেয়ে ভালো

উপায় আর কী হতে পারে? যার মা বাবা বাড়িতে নাচগানের ব্যবস্থা করে ঐ ছেলের ইলম হাসিলের কোনো সম্ভাবনা নেই, তার মাহরূম হওয়া নিশ্চিত। আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর দ্বীনকে হিফাযত করতে চান তাহলে ঐ ছেলেকে আলিম বানাবেন না। কোনো না কোনো ভাবে সে ইলম থেকে মাহরূম হয়েই যাবে। আজ হোক কিংবা আগামী কাল। এখন বাঁচার একমাত্র উপায় হল ঐগুলোকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং তাতে শরীক না হওয়া। তাহলে আল্লাহ মেহেরবানী করে তাকে ইলম দিয়ে দিবেন।

মোটকথা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তালিবুল ইলম যদি হারাম গিযা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, পর্দার উপর পুরা মযবুতীর সঙ্গে আমল করে এবং নাচগান ইত্যাদি গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম দান করবেন।

এ ধরনের আরো কিছু কারণ আছে, যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু সেগুলো থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহ তাআলা রেখেছেন।
পক্ষান্তরে কিছু কারণ আছে যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু তালিবুল ইলম তা থেকে বেঁচে থাকে না। এটা তো আরও মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের পথের সকল বাধা থেকে বেঁচে থাকার এবং ইলম হাসিল হওয়ার যাবতীয় আসবাব ইখতিয়ার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/en/article/99/ & https://www.alkawsar.com/en/article/209/ ]

## হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম এর বয়ান

ইলমের জন্য দুআর ইহতিমাম করতে হবে

ইলম আল্লাহ পাকের সিফাত। এ সিফাত তাঁর থেকে নিতে হবে। এজন্য দুআর ইহতিমাম করতে হবে। দুআ ছাড়া শুধু যেহেন-যাকাওয়াত দিয়ে ইলম হাসিল হয় না। মাওলার থেকে নিতে হলে দুআর ইহতিমাম করতে হবে।

তালিবুল ইলমের নিয়ত

দুই নাম্বার হল নিয়ত। চারটা নিয়ত বিশেষভাবে থাকা দরকার।

১- ইলমে দ্বীন অর্জন করব রেযায়ে ইলাহীর জন্য।

২- ইলম মোতাবেক আমল করার জন্য।

৩- আমি যে ইলম শিখব তা শুধু আমার এলাকাতেই নয়; বরং সারা বিশ্বে এ ইলমের প্রচার-প্রসার ঘটাব।

৪- আল্লাহ পাক যদি আমাকে কলমি শক্তি দেন, লেখার যোগ্যতা দেন, তাহলে লেখার মাধ্যমে এ ইলমকে আমি সারা বিশ্বে প্রচার করব। একজন তালিবে ইলমের কমপক্ষে এ চারটি নিয়ত করা চাই।

ইলমের জন্য ইনহিমাক জরুরি

ইলমী মারহালা তয় করার জন্য নিয়তের পরে যে জিনিসটা খুব বেশি জরুরি, সেটা হল, ইনহিমাক। একাগ্রতা।একসূয়ী। একাগ্রতা-একসূয়ী যত বেশি হবে, ইলমী ফায়যানও তত বেশি হবে। খোদ যিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, তাঁর কাছেও ওহী আসার আগে - حُبِبَ إليه الْخَلاء- একাকী থাকাকে আল্লাহ পাক প্রিয় করে দিয়েছেন। কাজেই ইলমী মাকাম তয় করার জন্য মৌলিকভাবে খালওয়াত, একাগ্রতা ও একসূয়ী অপরিহার্য।

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেছেন’ খালওয়াত হলে সুকূন হয়। আর সুকূনের কাইফিয়াত হলে ইতমিনানের সাথে ইলম হাসিল করা যায়। এর বিপরীত যদি ইখতিলাত ও মেলামেশা হয় তাহলে ইনতেশার শুরু হয়। ইনতেশার দ্বারা দিল বে-চাইন হয়ে যায়। পেরেশান হয়ে যায়। সুকূন নসীব হয় না। ইলমের মাকামও তয় করা যায় না। রূহানিয়্যাতের মাকামও তয় করতে পারে না।

এজন্য ইলমী মাকাম তয় করতে হলে খালওয়াত, একাগ্রতা, একসূয়ী, একমন, একধ্যান, একখেয়াল থাকাটা অপরিহার্য। আর এটা যার মধ্যে যত বেশি হবে, তার কলবে ইলমে নববীর ফায়যান তত বেশি হবে। আমার উস্তায মাওলানা ওয়াহিদুয যামান কিরানবী ছাহেব হুযূর বলতেন- কিছু তালিবে ইলম এমন আছে, যার জিস্ম দরসগাহে ঠিক, কিন্তু দিল-দেমাগ দরসগাহে নেই। সে অন্য কোথাও সফর করছে। তার যেহেন এবং ফিকির অন্য কোথাও। উস্তাযের তাকরীর শুনছেও না, বুঝছেও না। তার দেমাগে হয়ত তার বাড়ির কোনো ঝামেলা বা পেরেশানী আছে। সেখানে চক্কর দিচ্ছে। কিংবা কোনো বন্ধুর সাথে সম্পর্ক আছে, সেখানে চক্কর দিচ্ছে। দরসগাহে তার জিসম আছে; কিন্তু তার দিল-দেমাগ

নেই। এজন্য দরসে বসতে হলে শুধু জিসমানী হাজিরী যথেষ্ট নয়। বরং নিজের দিল-দেমাগও সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত রাখতে হবে।
মনে রাখবেন, একসূয়ী-একাগ্রতার কোনো বিকল্প নেই। একসূয়ী-একাগ্রতার আদনা মেছাল হল পরীক্ষার আগের সময়টা। যখন তালিবে ইলমের যেহেন সবকিছু থেকে সরে কিতাবে এসে যায়। এজন্য তখন অল্প সময়ে অনেক মুতালাআ করা যায়। কিতাব তাড়াতাড়ি ইয়াদ হয়ে যায়। কেন এটা হয়? একাগ্রতা-একসূয়ী আছে এজন্য।

বর্তমান যুগে একাগ্রতা-একসূয়ীর সবচেয়ে বড় বাধা হল মোবাইল ফোন। ফেইসবুকসহ আরো বিভিন্ন ঝামেলা। একজন তালিবে ইলমকে ধ্বংস করার জন্য, ইলমী মাকাম থেকে তাকে সরানোর জন্য এটাই যথেষ্ট।
এজন্য প্রতিটি তালেবে ইলমকে শপথ নিতে হবে, যত দিন আমি অন্তত রসমী তালিবে ইলম আছি, এমনিতে তো "মিনাল মাহদি ইলাল লাহদ" হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্তই তালিবে ইলম। কিন্তু রসমী তালিবে ইলম যাকে বলা হয়, এ সময়টায় অন্ততপক্ষে কোনো তালিবে ইলমের কাছে যেন কোনো মোবাইল ফোন না থাকে। মোবাইলের সাথে যেন কোনো সম্পর্ক না হয়। তালিবে ইলমের সম্পর্ক হবে কিতাবের সাথে। উস্তাযের সাথে। মাদরাসার ঘর-দোরের সাথে। বাইরের জগতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক হবে না। বরং সম্পর্ক হবে কিতাবের সাথে। এমন গভীর সম্পর্ক হবে যে, সে মোতালাআয় ডুবে যাবে। এমনভাবে ডুবে যাবে যে, নাওয়া-খাওয়াই ভুলে যাবে। পিপাসার কথা ভুলে যাবে। কোনো কিছুরই খবর থাকবে না। হযরত শায়েখ যাকারিয়া রাহ.-এর ঘটনা। সকাল বেলা বাসা থেকে খাবার আসে। কিন্তু ইলমী ইনহিমাকে তিনি এত ডুবে ছিলেন যে, খাওয়ার কথা ভুলেই গেছেন। সারা দিন না খেয়ে মুতালাআ ও দরসের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। আসরের পরে হঠাৎ দেখেন যে, মাথা চক্কর দিচ্ছে। চিন্তা করলেন, কীরে, মাথা চক্কর দেয় কেন? পরে মনে পড়েছে, আজকে তো খাবার খাওয়া হয়নি!
চিন্তা করুন, কতটুকু ইলমী ইনহিমাক থাকলে মানুষ ক্ষুধার কথাও ভুলে যেতে পারে! মাওলানা আব্দুল হাই লখনবীর মশহুর কিসসা। মুতালাআর সময় তিনি পানি চেয়েছেন। তাঁর ওয়ালেদ ছাহেব মাওলানা আব্দুল হালীম ছাহেব বললেন, হায়রে, আমার খান্দান কি এভাবে শেষ হয়ে যাবে?! খাদেমকে বললেন, পানি দিও না! এক গ্লাস কেরোসিন তেল দাও! খাদেম তাই করল। কেরোসিন তেল দিয়েছে, আর তিনি সেই তেলই খেয়ে ফেলেছেন এবং মুতালাআর মধ্যে ডুবে গেছেন। তাঁর ওয়ালেদ ছাহেব হাকীম ছিলেন। এতগুলো কেরোসিন তেল খেয়েছে, স্বাস্থ্যের জন্য তো ক্ষতিকর হবে। তাই সেটার

এলাজের জন্য পরে তিনি আবার ওষুধ দেন এবং বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! খান্দান বাকি থাকবে। অর্থাৎ, মুতালাআর সময় কি পানি খেয়েছে, না কেরোসিন তেল খেয়েছে সে অনুভূতিটাও ছিল না। ইলমী ইনহিমাক কী জিনিস, তা বোঝানোর ভাষা আমার কাছে নেই।

ذوق ایں بادہ نہ دانی بخدا تانہ چشی۔

মুতালাআর স্বাদ

আসলে মুতালাআর মধ্যে যত স্বাদ আর যত মজা, দুনিয়ার আর কোনো কিছুর মধ্যে এত স্বাদ আর এত মজা নেই। মুতালাআর মধ্যে যে স্বাদ আর মজা রয়েছে, এর চেয়ে স্বাদের জিনিস, এর চেয়ে মজার জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। যদি সত্যিকারার্থে যওকে মুতালাআ সৃষ্টি হয়, শওকে মুতালাআ এসে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ, ইলমী মাকাম তয় হবে। দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত আমরা যে লেখাপড়া করি, এখানে ইলম অর্জন করি না। বরং যেটা অর্জন করি সেটা হল 'কুওয়াতে মুতালাআ'। আর কিছুই অর্জন করিনি। ইলম আসেনি। এসেছে কুওয়াতে মুতালাআ। মুতালাআ করলেই এখন ইলম আসবে।

এজন্য হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেছেন, ফারাগাতের পর কমপক্ষে দশটি বছর মুতালাআর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা চাই। অন্য কোনো শগফ, অন্য কোনো শুগল যেন আমাকে পেয়ে না বসে। তাহলে কিছুটা হলেও ইলমী মুনাসাবাত পয়দা হবে।

শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহ. তাদরীসও করতেন, মাঠে ময়দানে কাজও করতেন। কিন্তু তাঁর যিন্দেগির একটা সময় এমন গিয়েছে যে, তিনি শুধু মুতালাআর মধ্যে ডুবে ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় যখন পড়াতেন, কোনো কোনো দিন ১২-১৪ ঘণ্টাও পড়াতেন। কারণ শুধু হানাফী মাযহাব নয়, মাযাহিবে আরবাআর কিতাব পড়াতেন তিনি। ওয়াসী মুতালাআর অধিকারী ছিলেন। মুখস্থ তাকরীর করতেন হাওয়ালাজাতসহ।

তো, মসজিদে নববীর মত বা-বরকত জায়গায়, রওজায়ে আতহারের পাশে বসে দরস দিয়েছেন এবং নিজেকে মুতালাআর মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। ওই যমানায় সংসারে অভাব-অনটন দেখা দিয়েছিল। না খেয়ে এক দিন, দুই দিন, তিন দিনও ছিলেন। এ অবস্থায়ও ছবক পড়াতেন। কোনো ছাত্র টের পেত না। সংসারের উপর কঠিন হালাত গিয়েছে। কিন্তু এ দুরবস্থা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। ইলমের মধ্যে মগ্ন ছিলেন।

এটা তো আমাদের নিকটতম আকাবিরের কথা। আর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং সালাফে সালেহীনের হালাত তো আপনারা জানেনই। মুহাম্মাদ ইবনে ফযলকে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বললেন, আপনি লেবাসের ঐ হাদীসটি আমাকে শোনান!

তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বললেন, যদি আপনার কিতাব থেকে শোনাতেন..! মুহাম্মাদ ইবনে ফযল কিতাব আনতে উঠলেন আর ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন তাঁর কাপড় চেপে ধরলেন। বললেন, আগে (মুখস্থ) লিখিয়ে দিন। কারণ আশংকা আছে আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হওয়ার। তাই তিনি হাদীসটি আগে (মুখস্থ) লেখান। এরপর কিতাব এনে তাঁকে পড়ে শোনান।

এ ঘটনা থেকে আমাদের দুটো ছবক নেওয়ার আছে।

**এক হল**, মুহাদ্দিসীনে কেরাম মওতকে একেবারে নিজের চোখের সামনে মনে করতেন। ইসতেহযারে মওত তাদের কী পর্যায়ের ছিল, এ ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়!

**দ্বিতীয়ত** ইলমের শওক তাদের কী পরিমাণ ছিল সেটাও বোঝা যায়। আপনি বাসায় যাচ্ছেন কিতাব আনতে, এর মাঝে যদি আমি মারা যাই, তাহলে তো হাদীসটি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। এজন্য আগে মুখস্থ শুনিয়ে যান, পরে কিতাব থেকে শুনিয়েন! শামায়েলে তিরমিযীর কিতাবুল লেবাসে এ ঘটনা আছে। আকাবিরে আসলাফে উম্মতের ইলমী ইনহিমাকের ঘটনা কিতাবে ভুরি ভুরি। সেগুলো মুতালাআ করে জেনে নিবেন! এ মওযু তো লম্বা মওযু!

আল্লাহ পাক প্রতিটি ভাইকে যওকে মুতালাআ এবং শওকে মুতালাআ দান করুন! ইলমি ইনহিমাক দান করুন- আমীন।

ভাই! দুনিয়া ওয়া মা ফীহা থেকে গাফেল হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুতালাআর মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন। কারণ ইলমী ইনহিমাক, একাগ্রতা ও একসূয়ীর কোনো বিকল্প নেই। যদি থাকত, বলতাম। যারাই ইলমী মাকাম তয় করেছেন, তাদের যিন্দেগীতে এ সিফাতটা ছিল আহাম। বর্তমান যুগে তালিবে ইলম তালাশ করে  পাওয়া যায় না।

নোটভিত্তিক পড়াশোনার ভয়াবহতা

এখন ছাত্ররা কিতাব বাদ দিয়ে ছুটছে নোটের পেছনে! বেফাকে যেহেতু ভাল ফলাফল করতে হবে, তাহলে কী করতে হবে?  নোট দেখতে হবে! সুওয়ালের জবাবগুলো সংগ্রহ করতে হবে। আমি আমাদের মাদরাসায় সেদিনও আলোচনা করেছি। বলেছি, তালিবে ইলমদের কাছে যত নোট আছে সব জমা নিয়ে নিন! কোনো নোট চলবে না। নোটের মৌলভীর এখানে দরকার নেই।

সত্যিকারার্থে মৌলভী বনতে হলে মূল কিতাব মুতালাআ করতে হবে। মূল কিতাব মুতালাআ না করে ইলম হাসিল করা যাবে না। ‘নোট-মোট’  চলবে না। ‘‘তোমরা পরীক্ষায় পাস কর, না ফেল কর, সেটা আমার দেখার বিষয় না। আমার এখানে নোট চলবে না!’’ যাইহোক, নোটভিত্তিক পড়ালেখার যে রেওয়াজ মাদরাসাগুলোতে ঢুকে পড়েছে, সেটা আরেকটা তাবাহী বটে। হযরত মাওলানা আবুল হাসান কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুর ‘তানযীমুল আশতাত’। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর একটা ইলমী কারনামা। বড় মেহনত করে লিখেছেন। অনেক তালিবে ইলম এ ‘তানযীমুল আশতাত’ মুতালাআ করে পরীক্ষা দেয়। আর অন্য কোনো শরাহ-শুরুহাতে হাত দেয় না। এ তালিবে ইলম এ খোলাসা মুতালাআ করে কখনো ইলমী মাকাম তয় করতে পারবে না। কেন পারবে না? কারণ এক পৃষ্ঠা খোলাসার পেছনে তাঁর হয়ত পাঁচশ পৃষ্ঠা, হাজার পৃষ্ঠা মুতালাআ ছিল। এরপর তিনি এ এক পৃষ্ঠার খোলাসা লিখেছেন। তাহলে তাঁর খোলাসার পেছনে মুতালাআ আছে পাঁচশ থেকে হাজার পৃষ্ঠা। এজন্য এ খোলাসার পেছনে তাঁর বসীরাত আছে। কিন্তু যে তালিবে ইলম সরাসরি খোলাসা মুতালাআ করছে, শরাহ-শুরুহাত দেখছে না, তার বসীরাত হবে কীভাবে?

বসীরাত অর্জন করতে হলে নিজস্ব মুতালাআ লাগবে। আগে নিজে ব্যাপক মুতালাআ করবে নির্দিষ্ট মওযুর উপর। এরপর নিজে খোলাসা তৈরি করবে। তিনি দশটা তাওজীহ করেছেন, তুমি দশটা নয়; পাঁচটাই কর। কিন্তু নিজে মুতালাআ করে খোলাসা তৈরি কর। তাহলে হবে কী, তোমারও এ খোলাসার পেছনে পাঁচশ পৃষ্ঠা মুতালাআ থাকবে। আর মাসআলার উপর তোমার বসীরাত তৈরি হবে।

এজন্য নোটভিত্তিক লেখাপড়া, এটাও তাবাহী ও বরবাদির পয়গাম। আর শুধু খোলাসা দেখে দেখে মৌলভী বনা, সেটাও তাবাহী ও বরবাদির পয়গাম। সত্যিকারার্থে মৌলভী হতে হলে তোমাকে ব্যাপকভাবে মুতালাআ করতে হবে। একই মওযুর উপরে বিভিন্ন কিতাব মুতালাআ করতে হবে।

মুতালাআ তিন প্রকার

মুতালাআ তিন প্রকার।

**এক নাম্বার** হল কিতাবভিত্তিক মুতালাআ। যিনি যে কিতাব পড়াবেন, তার কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কামা হক্কুহু হল থাকা চাই। ইবারত, তরজমা এবং মতলব হুযূরের

যেহেনে পরিষ্কারভাবে থাকতে হবে। ঝাপসা নয়। কিছু লোকের অবস্থা হল- 'উন কে পা-স মা'লুমাত তো হ্যাঁয়; লেকিন ইলম নেহী হায়!'

এমন কিছু লোক আছে, যার মালুমাত আছে; কিন্তু ইলম নেই। নিজেই বোঝে না। ওই যে, ইবারত মুখস্থ আছে, আর তরজমা উল্টা-সিধা করে দিচ্ছি। আসলে বিষয়টি কী, তা নিজেই বোঝে না। এজন্য অনেকের কাছে মা'লুমাত আছে, ইলম নেই। ইলম আর মা'লুমাত এক নয়। বরং মাসআলার আগাগোড়া বোঝার জন্য তাদাব্বুর ও গবেষণা লাগবে। তাহলেই আপনার মধ্যে ইলম আসবে।

যাইহোক, আসরে হাজেরের ফিতনাগুলো সম্পর্কে একটু তাম্বীহ করছি। এক হল নোটের ফিতনা, যেটা বেফাকভুক্ত বিভিন্ন মাদরাসায় ঢুকে পড়েছে। এজন্য বেফাকও এখন প্রশ্নপত্রের পলিসি বদলে দিয়েছে। পরীক্ষা হবে ইসতে'দাদের; মা'লুমাতের নয়। সেজন্যই ই'রাব লাগানো, হাদীসের তরজমা, আলফাযে গরীবা আসলে তার হল্লে লোগাত, এগুলো চাওয়া হয়। এখন যার কিতাবী ইসতে'দাদ নেই সে জবাব দিতে পারবে না। সে এখানে ধরা পড়ে যাবে। নোটকে মার দেওয়ার জন্যই বেফাক এ পলিসি বদল করেছে।

যাইহোক, আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হল, খোলাসা পড়ে, নোটবুক পড়ে আমি মৌলভী হতে পারব না। আমাকে ব্যাপক মুতালাআ করে আসতে হবে। এ মুতালাআ তিন প্রকার।

এক নাম্বার যেটা বললাম, কিতাবভিত্তিক মুতালাআ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কামা হক্কুহু কিতাবের ইবারত সহীহ পড়া চাই। ইবারতের সহীহ তরজমা করা চাই। কোথাও যেন ঝাপসা না থাকে। এভাবে পরিশ্রম করতে হবে। এ হল এক নাম্বার মুতালাআ। কিতাবভিত্তিক মুতালাআ।

## দ্বিতীয় প্রকার মুতালাআ

দুই নাম্বার হল, ফন্নী মুতালাআ। ফন্নী মুতালাআর জন্য যে বিষয়ে ধরব, তার নিচের থেকে উপরের সংশ্লিষ্ট সব কিতাব মুতালাআ করতে হবে। যেমন কিতাবুত তাহারাতের মুতালাআ শুরু করেছেন, তো নিচের কিতাব- তালীমুল ইসলাম, বেহেশতি জেওর, মালাবুদ্দা মিনহু, নূরুল ঈযাহ, কুদূরী, কানযুদ দাকায়েক, শরহে বেকায়া, হেদায়াসহ দরসিয়্যাতের সকল কিতাব থেকে তাহারাতের উপর মুতালাআ করতে হবে।

এরপর চলে যাব উপরের কিতাব; বাদায়েউস সানায়ে, আলবাহরুর রায়েক, ফাতাওয়া আলমগিরী, ফাতাওয়া শামীসহ আরো যেসব কিতাব আছে সেগুলোতে। তাহারাতের উপর সব কিতাব থেকে মুতালাআ করব। এর নাম হল ফন্নী মুতালাআ।

ফন্নী মুতালাআতে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হল, পুরো মুতালাআর পরে যে খোলাসা ও নির্যাস বের হবে, সেটা আমাকে একটা খাতায় নোট করতে হবে।
দ্বিতীয়ত কোন কিতাবে বা কোন শরহে নতুন কী পাওয়া গেল, সেটা হাওয়ালাজাতসহ নোট রাখতে হবে। ফন্নী মুতালাআ যদি এ তরিকায় হয় তাহলে ফায়েদা হল, পরে এ নোট দেখলেই পুরো বহস সামনে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ! কিতাবুস সালাত শুরু হয়েছে তো, নিচের থেকে উপর পর্যন্ত সব কিতাবের মুতালাআ করতে হবে সালাতের ওপরে। তাহলে একটা অভিজ্ঞতা হাসিল হবে।
এখানে আবার নোট করতে হবে সালাতের মূল মাসায়েলগুলো কী কী? মিন হাইসু আনওয়াইস সালাত কী কী মাসআলা আছে? এবং হার মাসআলার আগাগোড়া, খোলাসা কী, সেটা নিজস্ব আঙ্গিকে সাজাতে এবং গোছাতে হবে। এভাবে হয় ফন্নী মুতালাআ। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব কিতাব মুতালাআ করে তার খোলাসা বের করা।
আসরারে শরীআত সম্পর্কে জানতে হলে শাহ ওয়ালী উল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা মুতালাআ করতে হবে। মাসআলার লিম ও হেকমত এবং একেক কিতাব ও বাবের মাসআলাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও তারতীব জানতে হলে বাদায়েউস সানায়ে মুতালাআ করতে হবে। ইসতেদলাল বিল হাদীস পড়তে হলে নাসবুর রায়াহ' আছে। আহকামুল কুরআন, আবু বকর জাসসাস, তাফসীরে মাযহারী এ ধরনের কিতাব।

এগুলো মুতালাআ করলে ইসতেদলাল বিল হাদীস, অর্থাৎ মাসআলার উপর হাদীস দিয়ে দলীল দিতে সক্ষম হবে। বর্তমানে গায়রে মুকাল্লিদের ফিতনা চলছে। যেন হার মাসআলাতে হাদীস দিয়েও ইসতেদলাল করা যায়। যাতে এটা না বলতে পারে যে, হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলোর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই। তো দুই নাম্বার হল ফন্নী মুতালাআ।

## তৃতীয় প্রকার মুতালাআ

আর তিন নাম্বার হল কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপক মুতালাআ। কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপক মুতালাআর দ্বারা এক আম বসীরত অর্জন হবে। এই আম বসীরতকে তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন বলা হয়। নেসাব কিন্তু দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হওয়া নয়। নেসাব হল, তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন- দ্বীনের ব্যাপক সমঝ অর্জন করা।

## তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন-এর জন্য মুতালাআয়ে কুরআনের বিকল্প নেই

দ্বীনের বসীরত অর্জন করা। এর জন্য কুরআনে কারীমের ব্যাপক তিলাওয়াত লাগবে। নফসে কুরআনে কারীমের ব্যাপক তিলাওয়াত লাগবে।

আমাদের ছাত্র মাওলানা হেমায়েত একবার প্রশ্ন করল, হুযূর! রমযান কীভাবে কাটাব? আমি বললাম যে, রমযানে কোনো কাজ নেই। কাজ শুধু একটাই; কালামে পাকের তিলাওয়াত। সারা রমযান শুধু কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতে কাটাবে! সাথে একটা খাতা রাখবে। বিষয়বস্তুগুলো নোট করবে।

কথার কথা, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা কুরআনে কারীমে কত বার এসেছে? কত সূরায় এসেছে। তিলাওয়াতের ফাঁকে এটাও নোট করে ফেলবে। বিভিন্ন  আম্বিয়ায়ে কেরামের হালাত কুরআনে পাকে এসেছে; কোন নবীর হালাত কত জায়গায় এসেছে, তিলাওয়াতের ফাঁকে এটাও নোট করে ফেলবে। আহকামের আয়াতগুলো নোট করবে। এভাবে কুরআনে কারীমের কাসরাতে তিলাওয়াত করতে হবে, মা'আ তাদাব্বুর। রমযানে আর কোনো কাজ নেই। কাজ একটাই। ফায়েদা হবে কী? পুরো মাযামীনে কুরআন তোমার চোখের সামনে ভাসতে থাকবে ইনশাআল্লাহ! আর ইলমে নববীর সারে-চশমা হল কুরআনে কারীম।

এজন্য কুরআনে কারীম থেকে আলগ হয়ে আর যাই হোক, মৌলভী হওয়া যাবে না। মৌলভী হতে হলে কালামে খোদাওয়ান্দীর কাসরাতে তিলাওয়াত লাগবে। বিশেষভাবে রমযান মাস কুরআনের মাস। সমস্ত আসমানী কিতাব আল্লাহ পাক রমযান মাসে অবতীর্ণ করেছেন। এজন্য রমযান মাসকে বিশেষভাবে কালামে খোদাওয়ান্দীর জন্য রাখতে হবে। ব্যাপক তিলাওয়াত করতে হবে।

আকাবিরে দারুল  উলূম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা একটা আহাম বৈশিষ্ট্য যে, রমযান মাস তাঁরা তিলাওয়াতেই কাটাতেন। এমনিতেই মৌলভী হতে হলে কাসরাতে তিলাওয়াত লাগবে। তাহলে মাযামীনে কুরআন চোখের সামনে ভাসবে ইনশাআল্লাহ! আকীদায়ে তাওহীদ, আকীদায়ে রেসালাত, আকীদায়ে আখেরাত, জান্নাতীদের আহওয়াল, জাহান্নামীদের হালাত, এসব কিছু কুরআনে আছে কি না? সিফাতে রাব্বানিয়ার বয়ান, সিফাতে সুবূতিয়ায়ে জাতিয়া, সিফাতে সুবূতিয়ায়ে আফআলিয়া, সিফাতে সালবিয়া, সবগুলোই আছে কুরআনে।

কুরআনের কোনো কোনো জায়গায় সিফাতে সালবিয়ার আলোচনা আছে, যেমন-

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ ...
سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ
یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ

এরকম সিফাতে সালবিয়াগুলো বের করা। সিফাতে যাতিয়া সাতটা বা আটটা। শরহে আকাইদে আছে, আল্লাহ তাআলা 'হাই' হওয়া। 'কায়্যুম' হওয়া। ইলম, কুদরত, সাম', বাছর- এগুলো সিফাতে যাতিয়া।

যাইহোক, তিলাওয়াতের সময় এগুলো লক্ষ্য রাখবেন। সিফাতে আফআলিয়া-

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

এটা গায়রে মুতানাহী। বমা'না-

لا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ.

মোটকথা কুরআনে কারীম আল্লাহ তাআলার মা'রেফাতে ভরা। তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের তা হাসিল করা দরকার।

## তাযকিয়ায়ে বাতেন : গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়

আর তাযকিয়ায়ে বাতেনের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ।

এক-

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ .

অর্থাৎ কালামে খোদাওয়ান্দীর তিলাওয়াত।

দুই-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ .

অর্থাৎ, সালাত কায়েম করা।

তিন-

وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ .

অর্থাৎ, যিকরুল্লাহর কাসরত।

ইসলাহে নফসের জন্য এ তিনটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এর মধ্যে এক নাম্বারই হল, কালামে খোদাওয়ান্দীর তিলাওয়াত। **প্রথমত** হল সিফাতে রাব্বানীকে ইলমীভাবে জানা।

**দ্বিতীয়ত** সিফাতে রাব্বানীর তাআল্লুক হবে তার কলবের সাথে।

**তৃতীয়ত.** সিফাতে রাব্বানীর তাহাক্কুক হবে তার কলবের মধ্যে। অর্থাৎ, সিফাতে রাব্বানীর তাজাল্লী তার সীনা এবং তার কলবের মধ্যে পড়বে। সিফাতে রাব্বানীর তাজাল্লী তার সীনা এবং কলবের মধ্যে যখন পড়বে, তখন কলব থেকে সকল রাযায়েল দূর হয়ে যাবে। কলব মুযাক্কা, মুসাফ্ফা হয়ে যাবে। আখলাকে হামীদা অটোমেটিকলি কলবে এসে যাবে। কিবর, হাসাদ, বুগয, সব দূরীভূত হয়ে তাওয়াযু, তাওয়াক্কুল, সবর, কানাআত এসব আওসাফে হামীদা কলবে এসে যাবে। রাযায়েল দূর হয়ে যাবে। যদি সিফাতে রাব্বানীর তাজাল্লী পড়ে দিলে।

**চতুর্থত,** এ তাজাল্লীর একটা আছর আছে। এর দ্বারা মানুষের সাথে হুসনে খুলুকের মাদ্দা এবং মাখলুককে নফা পৌঁছানোর মাদ্দা পয়দা হয়।

এজন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. তাযকীর বিআলাইল্লাহর মধ্যে সিফাতে রাব্বানীকেও এনেছেন। আর সিফাতে রাব্বানী আসবে কালামে পাকের তিলাওয়াত দ্বারা।

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًانِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا.

আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, অর্ধরাত বা তার চে' একটু কম, বা একটু বেশি কালামে পাক তিলাওয়াত করার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাতকে রাত কালামে পাকের তিলাওয়াতে কাটিয়ে দিয়েছেন। এজন্য এ উম্মতের সাখত হল, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের উপর।

আমরা মাদরাসায় পড়ি, অথচ আমাদের কাছে তিলাওয়াতের গুরুত্ব নেই। আহাম্মিয়াত নেই। এজন্য ভাই! বার বার বলছি, তিলাওয়াতের বিকল্প নেই।

## কুরআনের সাথে চার আমল

তাসহীহে কুরআন, কুরআনে কারীমের নাযেরা সহীহ হওয়া চাই। এটা **এক নাম্বারে** বলার দরকার ছিল। তাসহীহে কুরআন ফরযে আইন। কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা জরুরি। দাওরায়ে হাদীস পড়ছে, অথচ তিলাওয়াতে লাহনে জলী। তাহলে তার ফরযে

আইন বাদ পড়েছে। এজন্য কুরআনে কারীমের সাথে প্রথম আমল হল তাসহীহে কুরআন। তথা সিফাত, মাখরাজ ও তাজবীদের সাথে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত।

**দুই নাম্বার,** কুরআনে কারীমের সঠিক তরজমা।

**তিন নাম্বার,** কুরআনে কারীমের সঠিক মতলব বোঝা।

**চার নাম্বার,** কুরআন যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলো পালন করা। যা থেকে নিষেধ করেছে, তা বর্জন করা। তাহলে وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا -এর উপর আমল হবে।

## হাদীসের ব্যাপক মুতালাআ

এরপর আহাদীসে মুবারাকার উপরে ব্যাপক মুতালাআ হওয়া চাই। আহাদীসে মুবারাকা হল মৌলিকভাবে কুরআনে কারীমের বাস্তব তাফসীর। এজন্য হাদীসের সাথে মুনাসাবাত যার যত বেশি হবে, কুরআনে কারীমের সাথে তার তত বেশি গভীর সম্পর্ক হবে। হাদীস ছাড়া কুরআন বোঝা সম্ভব নয়। কুরআন বুঝতে হলে হাদীস লাগবেই।

আমরা তো জায়গা-জমিনের প্যাঁচ বুঝি না। একটা হল নকশা। আরেকটা হল খতিয়ান। খতিয়ানের মধ্যে জমিনের দাগ নাম্বার থাকে। পরিমাণ থাকে। কিন্তু জমিনটা মাঠের কোথায় অবস্থিত সেটা খতিয়ানে থাকে না। সেটা থাকে নকশার মধ্যে। উপমহাদেশে চারটা খতিয়ান হয়েছে। প্রথম জরিপ হয়েছে ১৯২৪ -এর দিকে। এটাকে সেটেলমেন্ট জরিপ বলে। এটা সি এস। এরপর হল এস এ। এটা দ্বিতীয় জরিপ। এরপর হল আর এস। এটা তৃতীয় জরিপ। আর চতুর্থ জরিপ হচ্ছে ইদানীং যেটা চলছে। সবখানে এখনো শেষ হয়নি। বোঝার জন্য বলা যেতে পারে, কুরআনে কারীম বমানযিলায়ে খতিয়ান। হাদীস হল বমানযিলায়ে নকশা। আর জমিনের ক্ষেত্রে ক্ষতিয়ান আর নকশাই যথেষ্ট নয়। সাথে আমিন লাগে। দ্বীনী বিষয়ে আমিন হল সাহাবায়ে কেরামের জামাআত। কেননা কুরআনে কারীমের তালীম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আফতাবে নবুয়ত থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কওল, ফে'ল, তাকরীর, আহওয়াল ও শামায়েল সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের পজিশন হল আমিনের পজিশন।

কুরআনের খতিয়ান, হাদীসের নকশা আপনাকে বুঝতে হবে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যার আলোকে। আর এ তিনোটার সমন্বয় সাধন করেছেন আইম্মায়ে আরবাআ। ইমাম আবু হানীফা রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ., ইমাম মালেক রাহ., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.।

এ চারো ইমাম কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা- এ তিনোটার সমন্বয় করে ইসলামী আইন আহকাম সংকলন, বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করেছেন। যাকে ফিকহ বলা হয়।

## ফিকহ কুরআন-হাদীসেরই সারনির্যাস

ফিকহ হল, মৌলিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যারই নির্যাস। খোলাসা এবং সারমর্ম। ফিকহ কোনো নতুন কিছু নয়। আর মুতাকাদ্দিমীনের ফিকহের মধ্যে সবই আছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ. ফিকহের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আপনারা সবাই জানেন- "معرفة النفس ما لها وما عليها."

এর মধ্যে ইলমে কালাম দাখেল। ইবাদত দাখেল। মুআমালাতও দাখেল। মুআশারাত দাখেল। আখলাকিয়্যাত দাখেল। আর এতরযে আমাদের নেসাবে কিতাবও আছে। যেমন- মা লা বুদ্দা মিনহু।

এটা কিতাবুল ঈমান দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে কিতাবুত তাকওয়াও আছে। ইমাম গাযযালী রাহ.-এর ইহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন, এটাও লেখা হয়েছে এ তরিকায়। অর্থাৎ, মুতাকাদ্দিমীনের ফিকহের আলোকে। আর মুতাকাদ্দিমীনের ফিকহে ইলমে কালাম (ইলমে আকাইদ)ও আছে। ইলমে তাসাওউফও আছে। ইলমুল আখলাকও আছে। পরবর্তীতে ইলমে কালাম মুসতাকেল আকার ধারণ করেছে। ইলমুল আখলাক এবং তাসাওউফ মুসতাকেল আকার ধারণ করেছে। আর বাকি তিনোটা ইলমুল ফিকহ-এর এই শিরোনামে রয়ে গেছে। অর্থাৎ ইবাদত, মুআমালাত এবং মুআশারাত, এগুলো মুতাআখখিরীনের ফিকহেও রয়ে গেছে।

তো যে কথা বলতে চেয়েছি, গায়রে মুকাল্লিদরা যে বলে, আমি আছি আর কুরআন আছে। আমি আছি আর হাদীস আছে। ইমাম আবু হানীফা আবার কে? ইমাম শাফেয়ী কে? ইমাম মালেক কে? আর তাদের মধ্যে যারা কট্টরপন্থী, তারা তো নাউযুবিল্লাহ, এমনও বলে যে, ইমামগণের তাকলীদ শিরক। তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তুমি তো এ যুগে বসবাস করছ। বলছ, সহীহ হাদীসের উপর আমল করবে। তা ভালো কথা।

কিন্তু এ হাদীস যে সহীহ, সেটা তোমাকে কে বলেছে? আল্লাহ পাক বলেছেন? নাকি নবীজী এসে বলে গেছেন? নিশ্চয় তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আসমায়ে রিজালের ইমামগণ এবং আইম্মায়ে জরহ ওয়াত তা'দীল সনদের উপর কালাম করে বলেছেন যে, এ হাদীসটা

সহীহ, ওটা হাসান, ওটা যয়ীফ। তাহলে আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন আল্লাহও নয়, আল্লাহর রাসূলও নয়। তো তুমিও তো অন্যকে মানছ, তাকলীদ করছ। তাহলে তুমিও তো আরেক মুশরিক! তুমি আমাকে একা মুশরিক বানাচ্ছ কেন? তুমি নিজেও তো মুশরিক!

## মুনাযারার একটি উসূল

আসলে মুনাযারার মধ্যে অনেক সময় ইলযামি জবাব দিতে হয়। তাহলে প্রতিপক্ষ জায়গাতেই চুপ হয়ে যায়। মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী আলাইহির রহ. কাছে এক আহলে হাদীস এসেছে মুনাযারার জন্য। বিষয় হল, কেরাত খালফাল ইমাম প্রসঙ্গ।

হযরত বললেন-

نہیں، میں مناظرہ نہیں کرونگا۔

সে বলে-

پھر بھی ہم آپ کا خیال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

হযরত বললেন-

العیاذ باللہ، اہل حدیث ہو کر میری رائے معلوم کرتے ہیں؟ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دی!

সে বলল-

نہیں، ہماری مراد یہی ہے کہ قرآن سنہ کے مطابق بتا دیں۔

হযরত বললেন-

اچھا ٹھیک ہے، امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی ابھی پہنچا، تو اب کیا کرےگا؟ رکوع میں جائے گا یا نہیں،آپ اگر کہیں کہ نہیں جائےگا، تواس سے خلاف لازم آئےگا "وإذا ركع فاركعوا " کا۔

আর যদি ইমামের সাথে রুকুতে চলে যায়, তো কেরাত কই গেল? তাহলে

"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

এ হাদীসের খেলাফ লাযেম আসবে। আর এমনিতেও ইমামের পিছনে কেরাত পড়লে-

"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".

এ হাদীসের খেলাফ লাযেম আসবে।

তো এখন আহলে হাদীস কী করবে? বলে-

آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔

হযরত বললেন-

پھنسایا نہیں، یہی توکام ہے۔

তারপর সে বলল-

اگر یہ اشکال ہم کرے تو آپ کیا جواب دینگے؟

হযরত বললেন-

ہمارا راستہ ہموار ہے، ہم سیدھے امام ابو حنیفہ کے پاس چلے جائینگے اور کہینگے ؛ یہ صورت حال پیش آیا، اب ہم کیا کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رح نے ہمیں بتا دیا کہ بیٹے! قرآن کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، حدیث کو بھی چھوڑنا نہیں ہے ، تو "وإذا ركع فاركعوا" کے مطابق رکوع میں چلے جاؤ، اور "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"اس حدیث کا تعلق امام اور منفرد کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔اور"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے۔

তাহলে জমা-তাতবীক হয়ে গেল কি না? হুযূর এভাবেই জওয়াব দিয়েছেন।

আরেক দিন হুযূর তাবলীগে গিয়েছেন মেওয়াতে। এক গায়রে মুকাল্লিদ ধরে বসেছে যে, মুনাযারা করবে। বিষয় হল রফয়ে ইয়াদাইন। হযরত বললেন-

میں تبلیغ کے لیے آیاہوں ، نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، میں رفع یدین کے بارے میں مناظرہ کے لیے نہیں آیا۔

সে নাছোড় বান্দা। বলে-

نہیں ، کرنا پڑے گا۔

হযরত বললেন-

اچھا ٹھیک ہے، صحابۂ کرام کی تعداد کتنی ہے بھئی بتاؤ! کتنے صحابہ نے رفع یدین کیا؟

সে বলল-

چار سو صحابہ سے رفع یدین ثابت ہے۔

হযরত বললেন-

صحابۂ کرام کی تعداد کتنی ہے؟

সে বলল-

ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔

তারপর মুফতী ছাহেব হুযূর বললেন-

بھائی! یہ کہ رہے ہیں کہ رفع یدین چار سو صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی کہ رہے ہینکہ صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چار سو نے رفع یدین کیا ہے، باقی نے ترک رفع کیا، اب جس کا جی چاہے رفع یدین کرے، جس کا جی چاہے ترک رفع کرے! چلو بھئی! ہم تبلیغ کے لیے آئے، چلو، تبلیغ میں لگ جائیں!

হুযূরের কথা এ ধরনেরই ছিল। ইলযামি জওয়াবের বড় ইমাম ছিলেন। মুনাযারার ইমাম ছিলেন। প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে যে শব্দ বের হত, সেটা দিয়েই তাকে জায়গায় বসিয়ে দিতেন। আল্লাহ পাক হুযূরকে এ মালাকা দিয়েছেন।
বাহার হাল ফন্নী মুতালাআ লাগবে। কিতাবভিত্তিক মুতালাআ লাগবে এবং কুরআন সুন্নাহর উপরে ব্যাপক মুতালাআ লাগবে।

আসরারে শরীআতের জন্য হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা মুতালাআ করতে হবে। এ মওযুর উপর আরো কিতাব আছে। আর মাসায়েলের ইলাল, হেকমত, এগুলোর জন্য বাদায়েউস সানায়ে। জুযইয়্যাত ভরপুর হল ফাতাওয়া শামীতে। এ ব্যাপারে তো হুযূররা আপনাদেরকে রাহনুমায়ী করছেন, করবেন। এজন্য আমার কিছু বলার বেশি প্রয়োজন বোধ করছি না। বাকি কথা একটাই- মুতালাআর বিকল্প নেই।
তবে মনে রাখবেন, শুধু মুতালাআই যথেষ্ট নয়।

## সোহবতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তরবিয়তের মধ্যে সবচেয়ে মুআছছির হল সোহবত। সোহবতের বিকল্প নেই। মানুষ সোহবত দ্বারা বনে। এটা আমরে বদীহী। ভালো বাবুর্চি হতে হলে কোনো ভালো বাবুর্চির সংস্পর্শে থাকতে হয়। ডাক্তার হতে হলে শুধু এমবিবিএস হলে চলে না।
আবার ইন্টারনি করতে হয় আলাদা দুই বছর। মশক করতে হয়। হাতেনাতে শিখতে হয়। এজন্য দ্বীন শিখতে হলেও আহলে দ্বীনের সোহবত ওয়া মাইয়্যাত লাগবে। সাহাবায়ে কেরামও বনেছেন সোহবতের দ্বারা। এজন্য তারবিয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল সোহবত।
**দুই নাম্বার হল,** দরস ও তাদরীস। দরস ও তাদরীস দ্বারাও মানুষের তারবিয়াত হয়।
**তিন নাম্বার** হল, মুতালাআ। আগেই বলেছি, শুধু মুতালাআ কিন্তু যথেষ্ট নয়। কারণ মুতালাআর মধ্যে প্যাঁচ আছে।

হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. মেছাল দিয়েছেন যে, আগের যুগের ডাক্তাররা মিকচার দিত। আর ওষুধের বোতলের উপর কাগজ দিয়ে দাগ লাগিয়ে দিত। তো, এখন ডাক্তার মিকচার দেওয়ার পর ওষুধের বোতলের উপরে কাগজ দিয়ে দাগ লাগিয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন,

দৈনিক এক দাগ করে খাবে! সে বাড়িতে গিয়ে ওষুধ খায়নি; খেয়েছে কাগজের দাগ। কারণ ডাক্তার দাগ খেতে বলেছেন। তারপর এসে বলছে- ডাক্তার সাহেব! কোনো উপকার তো হল না? ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, কী বলেন, উপকার হয়নি? দেখি, বোতল দেখান তো! সে বোতল দেখাল। ডাক্তার বললেন, হায়রে ওষুধ তো সব রয়েই গেল। তাহলে আপনি খেয়েছেন কী? সে বলল, কাগজের দাগ খেয়েছি!!

এজন্য সহীহ বুখারীতে আছে-

إنما العلم بالتعلم

আমার উস্তায মাওলানা নাঈম ছাহেব হুযূর তরজমা করতেন-

مستند علم وہی ہے جو استاذ سے حاصل کیا ہے-

নির্ভরযোগ্য ইলম সেটাই, যেটা উস্তায থেকে হাসিল করা হয়।

কাজেই শুধু মুতালাআ যথেষ্ট নয়; বরং মুতালাআর পরেও উস্তাযের কাছে মুরাজাআত করা চাই। কোনো ইবারত ঝাপসা মনে হলে উস্তাযকে জিজ্ঞেস করে হল করে নেওয়া চাই। অথবা গিয়ে বলবে, হুযূর! আমি এ মতলব বুঝেছি, এটা ঠিক আছে কি না?

তাহলে বেলা শক ওয়া শোবা মুতালাআ জরুরি। তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে নয়। বরং উস্তাযের নেগরানিতে হতে হবে। বিশেষ করে কোনো ইবারত ঝাপসা লাগলে নিজে গিয়ে উস্তায থেকে সহীহ মতলব ধরে নিতে হবে।

তো **এক নাম্বার,** সোহবত ওয়া মাইয়্যাত।

**দুই নাম্বার,** দরস ও তাদরীস।

**তিন নাম্বার,** উস্তাযের নেগরানিতে মুতালাআ।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তিনো তরীকায় ইসলাহে বাতেনের তাওফিক দান করুন- আমীন!

## গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন

ভাই! মা'সিয়াত হল যুলমাত। আর ইলম হল নূর। নূর এবং যুলমাত একসাথ হতে পারে না। এজন্য নিজেকে সব প্রকারের মা'সিয়াত থেকে হেফাযত করতে হবে।

মোল্লা আলী কারী রাহ. মেরকাতে স্পষ্ট বলেছেন-

هو نور مقتبس من مشكاة النبوة.

ইলম এক নূর, যা নবী আলাইহিস সালামের সীনা মোবারক থেকে বের হয়েছে।

"يهدي به إلى ذاته وصفاته وأحكامه"
এর মধ্যে ইলমে লাদুন্নী, ইলমে কাসবীসহ সবকিছু আছে। মেরকাতের কিতাবুল ইলম দেখুন!
তো ইলমের নূর আসতে হলে ভাই! নিজেকে মা'সিয়াত থেকে হেফাযত করতে হবে। মা'সিয়াত আর ইলমে লাদুন্নী, দুটো একসাথে জমা হতে পারে না।

## আলেমের মাঝে ইসতেগনা থাকা জরুরি

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেছেন, আলেমের শান তখন বনে, যখন তার মধ্যে ইসতেগনার মাদ্দা আসবে। যখন সে মুসতাগনী হবে। লোভ-লালসার শিকার যদি হয় কোনো আলেম, তাহলে সে আলেমের শান ঠিক রাখতে পারল না। আলেম হতে হলে তার আহাম সিফাত হল, মুসতাগনী হওয়া। নবাব সলিমুল্লাহ হযরত থানভীকে দাওয়াত করেছেন। হযরত শর্ত আরোপ করেছেন যে, আমাকে কোনো হাদিয়া-তোহফা দেওয়া যাবে না।

اگر یہ شرط منظور ہے تو دعوت قبول ہے

আর দ্বিতীয় শর্ত হল, সময়মত খাবার দিতে হবে আমাকে। নবাব সলিমুল্লাহ শর্ত মেনে নিয়েই হযরতকে এনেছেন। এক লোক হযরত থানভীকে দাওয়াত দিল। হযরত বললেন-
اس کی ذمے داری نواب صاحب کو ہے

নবাব ছাহেব যদি অনুমতি দেন তাহলে হবে, না হয় হবে না। নবাব ছাহেব অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি পাওয়ার পর সে লোক খাবার প্রস্তুত করতে গিয়েছে। কিন্তু খাবার সময়মত পৌঁছাতে পারেনি। নবাব সলিমুল্লাহ অত্যন্ত হুঁশিয়ার লোক ছিলেন। তিনি দাওয়াতের পরওয়া করেননি; বরং হযরতের জন্য সময় মত খাবার প্রস্তুত করে রেখেছেন। যখন দেখেছেন, ঐ লোক আসেনি, তাড়াতাড়ি খাবার পেশ করে দিয়েছেন হযরতের সামনে। হযরত খাবার খেয়েছেন এবং বে-ইনতেহা দুআ দিয়েছেন এবং বলেছেন- "নওয়াব ছাহাব ওয়াকেয়ী মুনতাযিম হ্যয়।" কারণ যদি তিনি ওই লোকের দাওয়াতের অপেক্ষা করতেন, তাহলে সময়মত খাবার দিতে পারতেন না। আর হযরতের কষ্ট হত।

দেখুন, কেমন সমঝদারির কাজ করেছেন নবাব ছাহেব। তারপর নবাব ছাহেব বুদ্ধি বের করলেন, হযরতকে তো কিছু না কিছু দিতেই হবে। প্রয়োজনে কোনো কৌশলে হলেও। তাই বললেন-

حضرت! ہمارے خاندان میں دستور ہے، لڑکے کو جب'بسم اللہ' کرایا جاتا ہے تو کچھ ہدیہ بھی دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے ہمارے لڑکوں کا 'بسم اللہ' ہو جائے، اور ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق کچھ ہدیہ بھی دینا پڑتا ہے۔

হযরত বললেন-

ٹھیک ہے، میں سب کے سامنے آپ کا ہدیہ قبول کر لوں گا، اورتنہائی میں یہ ہدیہ واپس کر دوں گا۔

নবাব ছাহেব বললেন-

حضرت! ہم سے بھول ہو گئی، معاف فرما دیجیے!

তাহলে দেখুন, আমাদের আকাবিরগণ কেমন মুসতাগনী ছিলেন!

বাহার হাল, আমাদের আকাবিরগণ মুসতাগনী ছিলেন। মুতাকাব্বির ছিলেন না।

মুতাকাব্বির আর মুসতাগনী এক নয়।

ভাই! মুতাকাব্বির নিজেকে বড় মনে করে, অন্যকে খাটো মনে করে। আর মুসতাগনী হল, যার কলবের মধ্যে গাইরুল্লাহ থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকে না। কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকে না। তার যত চাওয়া পাওয়া, সব আল্লাহর থেকে নেয়।

এজন্য তাসাওউফের মাসআলা আছে, ইশরাফে নফস হলে কোনো কিছু গ্রহণ করা যাবে না। কেউ তাকে দাওয়াত দিয়েছে, এখন আগেই খেয়াল করে রেখেছে যে, দাওয়াত যেহেতু দিয়েছে, কিছু টাকাও দিবে রে! তাহলে এ টাকা নেওয়া যাবে না। কারণ ইশরাফে নফস হয়ে গেছে।

তাহলে কতটুকু ইসতিগনা ছিল তাঁদের অন্তরে! হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী হযরত থানভীকে প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষ দাওয়াত দিয়ে যায়, পরে খেয়ালে আসে যে, দাওয়াত যেহেতু দিয়েছে হয়ত কিছু হাদিয়াও দিবে। তাহলে এটা ইশরাফে নফসের মধ্যে দাখেল হবে কি না?

হযরত থানভী পাল্টা প্রশ্ন করেছেন-

حضرت! اگر ہدیہ نہ دے تو دل میں کوئی گرانی ہوتی ہے کیا؟

হযরত বললেন-

الحمد للہ، اگر کچھ نہ دے تو دل میں ادنی درجے کی گرانی پیدا نہیں ہوتی۔

হযরত থানভী রাহ. জওয়াব দিলেন-

الحمد للہ، حضرت! پھر یہ اشراف نفس میں داخل نہیں۔

কেমন সূক্ষ্ম নযর ছিল তাঁদের! বাহার হাল, আলেমের শান মুসতাগনী হওয়া। আলেম যদি মুসতাগনী হয় তাহলে তার শান বেড়ে যায়। আর যদি ইহতিয়াজ এবং লোভ-লালসা থাকে, তাহলে সে সহীহভাবে আলেম হতে পারবে না। তার শানও থাকবে না।

## আসাতিযায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার নিআমত

আরেকটা কথা, আসাতিযায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার নিআমত। এ নিআমতের কদর করুন! আর নিজেকে মুতালাআর মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন! এর কোনো বিকল্প নেই। যত বেশি মুতালাআ করবেন, তত অগ্রসর হবেন ইনশাআল্লাহ!

আর উস্তাযের শানে কখনো বেআদবি করবেন না! কখনো না!! উস্তাযের আদব, ইহতিরাম বে-ইনতেহা জরুরি। উস্তাযের মহব্বত এবং আজমত যে তালিবে ইলমের সীনায় যত বেশি হবে, তার কলবের মধ্যে ইলমে নবুওতের ফায়যান তত বেশি হবে। আর যদি বেআদবি হয় তো সব শেষ! তখন যেহেন-যাকাওয়াতও কাজে আসবে না। এর বহু ঘটনা এবং মেছাল আছে। সেগুলো বলার এখন সময় নেই। মুখতাসার এতটুকু বললাম।

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. বলেছেন-

اگر دنیا میں چین وسکون سے رہنا ہے تو والدین کی خدمت کرو! اگر علم سے فائدہ اٹھانا ہے استاذ کا احترام کرو!

এজন্য আসাতিযায়ে কেরামকে সম্মান করতে হবে। কোনোভাবেই তাদের শানে বেআদবি করা যাবে না। এ দুটো বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন!

## সময়ের মূল্য অনুধাবন করুন

আর ভাই! সময় বড় দামি সম্পদ। হাদীসে স্পষ্ট আছে-

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

দুটো নিআমত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটা হল, স্বাস্থ্য।

আরেকটা হল, ফুরসতের সময়।
অধিকাংশ মানুষ এ দুই নিআমতের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত। স্বাস্থ্যের কদর করে না, আর ফুরসতের সময়ের দাম বোঝে না। কাজেই নিজেকে দামি বানাতে হলে সময়ের কদর করতে হবে। সময়কে কাজে লাগাতে হবে। সময় নষ্ট করা যাবে না।
এর উত্তম বুদ্ধি হল, চব্বিশ ঘণ্টার নেযামুল আওকাত তৈরি করে ফেলবেন! তাহলে একটা সেকেন্ডও নষ্ট হবে না। যে তালিবে ইলম যত বেশি সময়কে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে, সে তত বেশি নিজেকে দামি বানাতে সক্ষম হবে। আর যে তার উমরে আযীযকে নষ্ট করবে গল্পে গল্পে, আর হাসি তামাশায় এবং রং-ঢংয়ে, সে কিছুই বনবে না।
এজন্য সময়কে কাজে লাগাবেন! সময় নষ্ট করবেন না! আল্লাহ পাক এ প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন! এর সকল জরুরত তার গায়েবি খাযানা থেকে পুরা করে দিন- আমীন!
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব এবং তাঁর বড় ভাই মুফতী আব্দুল্লাহ ছাহেবসহ আরো যে সকল আসাতিযায়ে কেরাম এখানে কাজ করছেন, আল্লাহ পাক সবাইকে সিহহাত ও তনদুরুসতী দান করুন- আমীন! সকলের হায়াতের মধ্যে বরকত দিন! আরো বেশি বেশি কাজ করার তাওফিক দান করুন- আমীন!
আমরা যারা ছাত্র হিসেবে আছি, আল্লাহ পাক সবাইকে ইলমে নাফে‘ দান করুন! ইলমে গায়রে নাফে‘ থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

## ইলমে নাফে‘র জন্য চারটি শর্ত

**১. ফাহমে সহীহ।** আর ফাহমে সহীহ হয় না দুই কারণে। গবী হওয়া অথবা কাজরো হওয়া।
**২. ইয়াকীনে মুহকাম।** ইলম হাসিলের সাথে সাথে ইলমের উপর ইয়াকীন হতে হবে। ইলম আছে; ইয়াকীন নেই। এটা ইলমে নাফে‘ নয়। এজন্য আহলুল্লাহ, আহলে দিল এবং আহলে ইয়াকীনের সোহবত লাগবে।
**৩. আযমে কবী; দৃঢ় সংকল্প।** যা শিখেছি সে মোতাবেক আমল করা।
**৪. মুজাহাদায়ে কাহেরা।** অর্থাৎ, নফসের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে অটল অবিচল থাকা। শয়তান এবং নফস, এ দুটো মানুষকে দিয়ে গুনাহের কাজ করায়। এজন্য আমাকে আযম করতে হবে যে, শয়তান ও নফস যতই চেষ্টা করুক, এগুলোর ধোঁকায় পড়ে গোনাহ করব না। এ ব্যাপারে মুজাহাদায়ে কাহেরা এবং মুজাহাদায়ে গালেবা লাগবে। যেন শয়তান এবং

নফস মাগলূব হয়ে যায়। আর আপনি গালেব এবং কামিয়াব হতে পারেন। তাহলে ইলমে নাফে‘ পাবেন।
ফকীহুল উম্মাহ হযরত মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রাহ. বলেছেন, ইলমে নাফে‘ পেতে হলে এ চার শর্ত জরুরি।
নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইলমে নাফে‘র জন্য দুআ করেছেন। ইলমে গায়রে নাফে‘ থেকে পানাহ চেয়েছেন।

আল্লাহ পাক সব ভাইকে ইলমে নাফে‘ দান করুন- আমীন! ইলম মোতাবেক আমল করার তাওফিক দান করুন! ইলমের যথাযথ কদর করার তাওফিক দান করুন!

## আকাবিরে দেওবন্দকে জানুন

আর আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দকে বোঝার জন্য আকাবিরের জীবনী, মালফুযাত, মাকতুবাত, মাওয়ায়েজ, এ চার জিনিস মুতালাআ করবেন!
আলহামদুলিল্লাহ, এখন তো এসব মওযুর ওপর কিতাব পাওয়া যাচ্ছে। এর কোনো বিকল্প নেই। যদি আকাবিরে দেওবন্দের জীবনী, মাকতুবাত, মালফুযাত এবং মাওয়ায়েজের ব্যাপক মুতালাআ করেন, তাহলে যেহেন সাযী হবে। ফিকির সহীহ হবে। আর তা না হলে, কওমী মাদরাসায় পড়েও গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে যেতে পারে!
কওমী মাদরাসায় পড়েও -আল ইয়াযু বিল্লাহ- কাদিয়ানী হয়ে যেতে পারে! কওমী মাদরাসায় পড়েও আল্লাহ মাফ করুন, সা‘দপন্থী হবে। আরো বিভিন্ন ঝামেলা মাথায় ঢুকবে। কারণ আকাবিরের ফিকির পায়নি। আর আকাবিরের ফিকির জানতে হলে, বুঝতে হলে, আকাবিরের জীবনী, মাওয়ায়েজ, মাকতুবাত ও মালফুযাত, এগুলোর ব্যাপক মুতালাআ করুন!
আল্লাহ পাক সবাইকে আকাবির সম্পর্কে জানার এবং বোঝার তাওফিক দান করুন- আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[মুসাজ্জিলা থেকে পত্রস্থকরণ :মুহাম্মাদুল্লাহ মাসুম।
বয়ানের তারিখ :
১ মুহাররম ১৪৪০ হিজরী/১২-০৯-২০১৮ ঈসাব্দ]

তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/2435/

## পরিশিষ্ট

আমরা তালিবে ইলম। এটিই আমাদের প্রধান পরিচয়। আমরা এক বিশাল কাফেলা, সময়ের কোনো অংশ এবং পৃথিবীর কোনো ভূ-খণ্ড কখনো আমাদের উপস্থিতি থেকে শূন্য হয়নি। আমরা যেখানে যতদূরেই থাকি, আমাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান যতই থাকুক আমাদের পরিচয় একটিই-আমরা তালিবে ইলম।

ইলমের বন্ধনের চেয়ে বিস্তৃত ও গভীর বন্ধন আর দ্বিতীয়টি নেই।

আমাদের এই কাফেলার কাজ কী? কী তাদের দিবা-রাত্রির ব্যস্ততা? তার উত্তরও একটিই, যা নিহিত আছে ঐ পরিচয়মূলক শব্দটির ভেতরে। তালিবে ইলমের একমাত্র কাজ 'তলবে ইলম'। অর্থাৎ ইলম-অন্বেষণ। এছাড়া তালিবে ইলমের আর কোনো কাজ নেই। আমাদের দিন ইলম অর্জনের, আমাদের রাত ইলম অর্জনের। আমাদের শয়ন-জাগরণের কাজও ইলম অর্জন। আমাদের সব আয়োজন এবং আমাদের সব প্রয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু 'ইলম অর্জন।' ইলম অর্জনের নিমগ্নতায় কেটে যাবে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। চোখে ইলমের নূর। হৃদয় ও আত্মায় থাকবে তলবের জযবা।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন নয়। অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, আমরা যারা তালিবে ইলম, তাদের অবস্থা এখন বড়ই করুণ। বড়ই বেদনাদায়ক। নিমগ্নতা ও নিবিষ্টতার মহান সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। আমাদের তলবের জযবায় ঘুণ ধরেছে আর আমরা বিস্মৃত হতে চলেছি আমাদের আত্মপরিচয়। দোকানে-বাজারে যেকোনো মেলা ও মাহফিলে আমরা আছি। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই অনেকটা দর্শক হিসেবে আমরা মাহফিলে মাহফিলে ঘুরে বেড়াই। সুযোগ পেলেই মাদরাসা থেকে বের হয়ে যাই। যেন এসব আয়োজনে আমাদের উপস্থিতি একান্ত জরুরি।

অথচ ভালো কোনো মজমাতেও তো শুধু যাওয়ার জন্য যাওয়া এবং শুধু দেখার জন্য দেখা কোনো তালিবে ইলমের শান হতে পারে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যার সাধনার লগ্ন, তার আবার তামাশা দেখার সময় কোথায়?

তালিবানে ইলম তো মুয়াত্তা মালিকের ‘রাবী’ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মাসমুদী রাহ. (২৩৪ হি.)-এর কাফেলা। যিনি সুদূর আন্দালুস থেকে মদীনায় ইমাম মালেক রাহ.-এর দরসে এসেছিলেন।

সে যুগে আরব দেশে হাতি ছিল না। একদিনের ঘটনা। ইমাম মালেক রাহ.-এর দরসগাহে কে যেন বলল ‘হাতি এসেছে’। শোনামাত্র সবাই বাইরে ছুটে গেল। ইতিমধ্যে ইমাম মালেক রাহ. দরসে এলেন এবং শুধু ইয়াহইয়া মাসমুদীকে দেখতে পেলেন। ইমাম মালেক রাহ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহইয়া! তুমি গেলে না যে! তোমাদের আন্দালুসে তো হাতি নেই। তখন তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি তো সুদূর আন্দালুস থেকে এসেছি আপনাকে দেখার জন্য।’ এই উত্তর শুনে ইমাম মালেক রাহ. বললেন–

هذا عاقل الأندلس

এতো আন্দালুসের বুদ্ধিমান!

(নাফহাহুত তীব ২/৯)

ফল এই হয়েছিল, মুয়াত্তার দরসে হয়তো অনেকেই শরীক হয়েছিল, কিন্তু ইয়াহইয়া মাসমুদীর বর্ণিত মুয়াত্তার রেওয়ায়াতটিই মাশরিক ও মাগরিবে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কেউ হয়তো বলতে পারে, এ তো দূর অতীতের কথা। এখন কি এত নিষ্ঠা সম্ভব? তাহলে নিকট অতীতের একটি ঘটনা বলি। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী আযিযুল হক রাহ. (১৩৮০ হি.)-এর ছাত্রজীবনের কথা। তখন তিনি জিরি মাদরাসায় অধ্যয়নরত। তখন সবেমাত্র এ দেশের আকাশে বিমান উড়তে শুরু করেছে। একদিনের ঘটনা। বিমানের গর্জন শোনামাত্র দরসগাহের সবাই বের হয়ে গেল বিমান দেখতে। হযরত মুফতী আযিযুল হক রাহ. একটি কিতাব মুতালাআ করছিলেন। তাঁরও একবার মনে হল, জীবনে প্রথমবারের মতো এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি না হয় দেখেই আসি! কিন্তু আবার মনে হল, আহামরি আর কী হবে, কত পাখিই তো আকাশে উড়ে! একথা ভেবে আবারো মুতালাআয় ডুবে গেলেন। (তাযকিরায়ে আযীয, মাওলানা সুলতান যওক নদভী পৃ. ৩৮)

তামাশার পেছনে পড়েননি বলে আজও তারা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরাই স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবেন।

তাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের কথা ভেবে একজন তালিবে ইলম জীবনের মূল্যবান সময় বিসর্জন দিতে পারে না। জীবনের কোনো প্রয়োজন এমন আছে কি, যা ইলম অর্জনের

চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? অতএব অমুকের বিয়ে, অমুকের মৃত্যুসহ নানা প্রসঙ্গে আমরা যেভাবে অস্থির হয়ে ছুটে যাই তাতে এই প্রশ্ন অবশ্যই দাঁড়ায় যে, আমার উপস্থিতি সেখানে কতটা অনিবার্য ছিল? আমার অনুপস্থিতিতে কোন কাজটি অসম্পূর্ণ থাকত? মনে রাখতে হবে, সকল ডাকে সাড়া দিলে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব। আমার দিন-রাতের একমাত্র কাজ তো ইলম-অন্বেষণ। অতএব সাড়া দেওয়ার সময় কোথায়? আমাদের কাফেলার যারা আকাবির-রাহবার তাদের অবস্থা কিন্তু এমনই ছিল।

ফিকহুল মুকারানের প্রসিদ্ধ কিতাব 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' এর নাম আমরা সকলেই জানি। এই কিতাবের মুসান্নিফ আল্লামা ইবনে রুশদ রাহ. (৫৯৪ হি.) এর জীবনীতে এসেছে, 'জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর হতে তিনি দুটি রাত ব্যতীত কখনো ইলমী শোগল ছাড়া কাটাননি। একটি পিতার মৃত্যুর রাত, অপরটি তার বিয়ের রাত।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/৪৫২)

কিন্তু আমরা? আমরা কি এর কাছাকাছি কোনো ইতিহাস রচনা করতে পেরেছি? আমরাও একবার দেখে নিতে পারি আমাদের অতীত। তাঁরাও তালিবে ইলম আর আমরাও তালিবে ইলম!

এসব ঘটনা হয়তো আমাদের অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। আবার কারো মনে হতে পারে যে, এ তো সে যামানার কথা! বর্তমান যুগে কি তা সম্ভব? তাহলে এই যুগের একজন জ্ঞান-সাধকের কাহিনীও আমি তুলে ধরি। মেলালে বুঝা যাবে, দু' যুগের সাধকদের সাধনার কত মিল!

হাতের কাছে পুষ্পসমগ্র থাকলে এর ৩৯৬, ৪০২ পৃষ্ঠা উল্টে দেখুন। একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন। 'আমার আব্বা/দুই জীবনের সন্ধিক্ষণে' শিরোনামে সেই 'অশ্রুভেজা' লেখাটির কিছু অংশ তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

'... এখন রাত একটা। আব্বার জানাযা এখনও মাটির উপরে আমাদের ঘরে, যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেখানে। নীচে গিয়ে দেখে এলাম। মুখমণ্ডলে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। যেন পরম প্রশান্তির একটি স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তালিবে ইলমের জামাত তাঁকে

গোসল দেবে, কাফন পরাবে। আমি ফিরে এলাম আমার কাগজ-কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। ...

নীচে গিয়ে (আবার) দেখে এলাম। আমার এহরামের কাপড় দিয়ে আব্বাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। গোসলের পর আতর মেখে চোখে সুরমা লাগানো হচ্ছে। আমার হৃদয়ে একটি আনন্দ-তরঙ্গ অনুভূত হল, আব্বা কি আখেরাতের বাসরঘরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন!

আমি আবার ফিরে এলাম আমার কাগজ-কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। ... নীচে এলাম আব্বাকে আরেকবার দেখে আসতে। সবকিছু দেখে বড় শান্তি লাগলো। ... আমি আবার ফিরে এলাম আমার কাগজ-কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। আমারও হৃদয়ে সুন্দর মৃত্যুর তামান্না জাগছে। ...

এখন রাত তিনটা। নীচে গিয়ে আব্বাকে আবার দেখলাম। কাফন-সজ্জা হয়ে গেছে। তিনি এখন জানাযার খাটে শুয়ে আছেন। ... আম্মাকে দুটি সান্ত্বনার কথা বলে আমি ফিরে এলাম কাগজ কলমের কাছে। আজকের দেখা মৃত্যুর কথা লিখতে আমার ভালো লাগছে। আমার হৃদয়ে একটি সুন্দর মৃত্যুর তামান্না জাগছে।

আব্বার জানাযা নীচে আমাদের ঘরে। আর আমি কলম হাতে পুষ্পের দফতরে। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে, আর কলম থেকে শব্দ ঝরছে। আমি লিখে চলেছি আমার জীবনের প্রথম 'অশ্রুভেজা' লেখা। ...

' এ হল এ যুগের তালিবে ইলম আমাদের প্রিয় আদীব হুজুরের ঘটনা। শুনেছি, তার বিয়ের রাতেও ইলমী মাশগালা অব্যাহত রাখার সুযোগ হয়েছে।

সত্যি এটি যুগের পার্থক্য নয়, পার্থক্য শুধু মানসিকতার। সে যুগের তালিবে ইলম ইয়াহইয়া মাসমুদীরা যদি হাতি দেখতে বের না হন তবে এ যুগের মুফতী আযিযুল হকরা বিমানের পিছনে ছুটে চলেননি। সে যুগের ইবনে রুশদরা যদি পিতার মৃত্যু রাত্রি ও বিয়ে রাত্রি ছাড়া জীবনের অন্য কোনো রাত ইলমের শোগল ছাড়া না কাটিয়ে থাকেন, তবে এ যুগের ইবনে মিসবাহ সেই দু' রাতেও অব্যাহত রাখেন তাদের জ্ঞান-সাধনা। এ যুগ তো চায় আরো বেশি মেহনত, আরো বেশি মুজাহাদা।

অতএব আজ একবার আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে নিজেদের দিকে, চিনতে হবে নিজেদেরকে, জানতে হবে নিজেদের আত্মপরিচয়। অনুধাবন করতে হবে যে, জীবনের সব প্রয়োজন আমার নয়, সমাজের সব আয়োজনও আমার জন্য নয়। তাই জীবনের সব আহ্বানে আমার সাড়া দেওয়ার নয়, সমাজ ও সংসারের সব প্রয়োজনে ছুটে চলাও আমার দায়িত্ব বহির্ভুত। কারণ আমার লক্ষ্য তো মাত্র একটি। আর তা হল 'তলবে ইলম'। কারণ আমি যে 'তালিবে ইলম।'

—তালিবানে ইলমের পথ ও পাথেয়:৩২৬

## তথ্যপঞ্জি


১. তালিবে ইলমের জীবন গঠন, মাওলানা ইবরাহিম খলিল রচিত
২. ফরজে ইলমের পরিচয়, শাইখ আবদুল কাদির
৩. শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয়, শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা
৪. তালিবানে ইলমের পথ ও পাথেয়, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
৫. মাসিক আল-কাউসার